প্রকাশকের মন্তব্য।

উপন্যাস-প্লাবিত দেশে আর একখানি উপন্যাস প্রকাশিত হইল। এত কষ্ট, এত ব্যয়, সহ্য করিয়া কেন আবার এরূপ উপন্যাস-প্রচারে হস্তক্ষেপ করিলাম, অনেকে একথা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন। তাহার উত্তর দেওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

বর্ত্তমান পুস্তকের লেখক এ ব্রতে নূতন ব্রতী বটেন; কিন্তু তাঁহার লেখায় মাধুর্য্য ও পাণ্ডিত্য আছে, বর্ণনায় প্রাঞ্জলতা ও ভাবোদ্দীপকতা আছে, ভাষায় সরলতা ও মিষ্টতা আছে। তৎপরে তিনি মানবচরিত্র অঙ্কন করিতে নিপুণ শিল্পী বলিয়া আমাদের অনুমান হয়। সতীত্ব, লাম্পট্য, সদাচার, ব্যভিচার, কর্ম্ম-পরায়ণতা, কার্য্য-শৈথিল্য প্রভৃতি বিসদৃশ চরিত্র সকল পরিস্ফুট করিতে গ্রন্থকারকে শক্তিশালী বোধ হয়। বিশেষতঃ যে ঘটনা অবলম্বন করিয়া, এই এত বৃহৎ পুস্তকখানি রচিত হইয়াছে, তাহার সমস্ত ঘটনাই প্রকৃত সত্য, তাহা কল্পনার অতিরঞ্জিত চিত্র নহে। এই পুস্তক প্রকাশ করিবার জন্য আমাদের বলবতী ইচ্ছা হইবার ইহাই কারণ।

কেহ কেহ বা বলিতে পারেন যে, আমাদের সংসারের মধ্যে নিত্য অহরহঃ যে সকল ঘটনা আমাদের চক্ষুর সম্মুখে ঘটিয়া যাইতেছে, তাহা লিখিয়া এত বড় পুস্তক ছাপাইবার প্রয়োজন কি? বাস্তবিক ইহা সত্য, চক্ষুর সম্মুখে যাহা প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করি, পুস্তকে তাহা পড়িতে রুচি হয় না। কিন্তু মনে করুন, আমরা এই কলিকাতা সহরের নানা-স্থানের সুদৃশ্য সৌধ, সুরম্য উপবন, শীতল সলিলপূর্ণ সুন্দর

সরোবর, সুউচ্চ মন্দির-মসজিদ-গির্জ্জা, আবার সুবিস্তৃত প্রান্তর, বহুস্থান-ব্যাপী কুটীর শ্রেণী, প্রশস্ত রাজ-বর্ত্ম, প্রভৃতি নানা সময়ে, নানা ভাবে, নানা স্থানে দেখিতে পাই; পুনঃপুনঃ তাহা দেখিতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু যদি কোন উপায়ে,—অক্টারলোনী (মনুমেণ্টের) কীর্ত্তিস্তম্ভের উপর দাঁড়াইয়া, বা বেলুনের উপর চড়িয়া—একবারে উক্ত সমস্ত দৃশ্য দেখিবার সুবিধা করিতে পারি, তবে তাহা দেখিতে কতদূর ইচ্ছা হয়, এবং সেরূপে দেখিয়াও কত আনন্দলাভ করিতে পারি? সেইরূপ নানা সময়ের নানা ঘটনা যদি একস্থানে সমাবেশিত দেখিতে পাই, বহু বৎসরের ঘটনাবলী যদি অল্পক্ষণের মধ্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি, তবে তাহা দৃঢ়রূপে এত শীঘ্র হৃদ্‌গত হয় যে, সমস্ত জীবনে ক্রমে ক্রমে তদপেক্ষা অধিক ঘটনা দেখিলেও তত সহজে ও শীঘ্র তাহা অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারে না।

পাঠকগণ এই পুস্তক পড়িতে পড়িতেই দেখিতে পাইবেন, স্থানে স্থানে আপনাদিগকে আত্মহারা হইতে হইবে, শোক দৃশ্যে বাস্তবিকই কাঁদিয়া ফেলিতে হইবে, আবার বেশ্যা-ভবনে আমোদ-প্রমোদ দৃশ্যে যথার্থই হাস্য সম্বরণ করা দুষ্কর হইবে। বাস্তবিক আমরা প্রথমেই ইহার হস্তলিখিত পুস্তক-খানি পড়িয়া আনন্দিত হইয়াছি। এক্ষণে আমাদের ন্যায় পাঠকগণও আনন্দলাভ করিলে সুখী হইব ও অর্থ-কষ্ট-স্বীকার সার্থক মনে করিব। ইতি ১লা শ্রাবণ, সন ১৩০৫ সাল।

সিকদার বাগান বান্ধব পুস্তকালয় ও সাধারণ পাঠাগার।	শ্রীবাণীনাথ নন্দী, প্রকাশক।



গৃহ চিত্র

১ম অংশ।

বিজয়া।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভবেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও হরিচরণ মুখোপাধ্যায় এক গ্রামস্থ দুই ব্যক্তি কর্ম্ম উপলক্ষে কলিকাতায় একত্র অবস্থান করিতেন। নদীয়া জেলার বামন পাড়ায় ইঁহাদের বাসস্থান। কলিকাতা হইতে বামন পাড়া প্রায় ৮০ মাইল দূরবর্ত্তী হইলেও রেলপথে গ্রামবাসীর কলিকাতা যাতায়াত একরূপ সহজ-সাধ্য ছিল।

ভবেশ ও হরিচরণ কুলীন বংশোদ্ভব এবং দূরসম্পর্কে পরস্পরের ভ্রাতা। হরিচরণ ভবেশের মাতাকে খুড়ী মা এবং

ভবেশ হরিচরণের মাতাকে জেঠাই মা বলিয়া ডাকিতেন। এই উভয় পরিবারের সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ঠ না হইলেও, ইহারা প্রীতি ও সহানুভূতির বন্ধনে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট ও অনুরক্ত ছিল। ভবেশের বয়ঃক্রম ন্যূনাধিক বত্রিশ বৎসর; হরিচরণ ইঁহার তিন বা চারি বৎসরের কনিষ্ঠ। হরিচরণ মধ্যমাকৃতি, গৌরবর্ণ ও পুষ্টাবয়ব। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, প্রশান্তদৃষ্টি নেত্রদ্বয় এবং হাসিমাখা ওষ্ঠযুগল, উন্নত হৃদয় ও সচ্চরিত্রতার পরিচায়ক। সরলতা, বিশ্বপ্রেমিকতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা লইয়া যেন তাঁহার বদনমণ্ডল গঠিত; সুতরাং তাহা দর্শকের নয়নাভিরাম। ভবেশ অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাকার, শ্যামবর্ণ ও কৃশ। তাহাকে দেখিলেই বুঝা যাইত যে, কিশোরকালে সে সুরূপ ছিল, যৌবনে কদাচারী হইয়া স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য হারাইয়াছে। তাহার আয়ত নয়নযুগল অধুনা কোটরগত ও কালিমাময় এবং পাপবহ্নি যেন সদাই তাহাতে জ্বলিতেছে। তদুপরি সঙ্কীর্ণ ললাট। তাহাকে দেখিবামাত্রেই দর্শকের মনে কেমন একপ্রকার বিরাগ সঞ্চার হইত।

উভয়ের ভবিষ্য জীবনের ছায়া বাল্যকালেই পরিলক্ষিত হইয়াছিল। গ্রাম্য স্কুলে পাঠকালে শিক্ষকগণের মুখে হরিচরণের প্রশংসা ধরিত না। তাঁহার মত নম্র, সুবোধ, উদার-চরিত্র ও পাঠ-নিরত ছাত্র স্কুলে আর একটীও ছিল না। কিন্তু ভবেশের স্বভাব ঠিক ইহার বিপরীত। সে আদৌ পাঠে মনোযোগ করিত না এবং দুশ্চরিত্রতার জন্য প্রতিনিয়তই শিক্ষকদিগের নিকট প্রহার খাইত। শিক্ষকেরা পরিশেষে বুঝিলেন যে, যে উপাদানে ভবেশচন্দ্রের চরিত্র

গঠিত, তাহাতে বেত্রাঘাতে বিশেষ সুফল হইবে না; সুতরাং তাঁহাদের তাড়না শিথিল হইল। সুবোধ হরিচরণ দ্বাদশবর্ষ বয়সে মধ্য ইংরাজী ছাত্রবৃত্তি লইয়া কলেজে পড়িতে গেলেন; শ্রীমান্ ভবেশচন্দ্রও গ্রাম্যস্কুলের শিক্ষকদিগকে এক বিষম দুশ্চিন্তা হইতে অবসর দিয়া কলেজে পড়ার সাধ মিটাইবার জন্য হরিচরণের অনুসরণ করিল। সেই বৎসর ষোড়শবর্ষ বয়সে চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত পলাসপুরের হরমোহন রায়ের কন্যা বিজয়ার সহিত ভবেশের বিবাহ হয়। বিবাহে সে নগদ চারি শত টাকা এবং একপ্রস্থ রূপার বাসন ও ঘড়ি চেইন সমেত উপযুক্ত দান সামগ্রী পাইয়াছিল; কিন্তু তাহার পিতা ও মাতা আক্ষেপ করিতেন যে, ভবেশরত্ন স্বল্পপণে বিকাইয়াছেন। বিবাহের পর হইতেই ভবেশচন্দ্রের স্বাভাবিক পাঠবিরাগ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। শুনা যায় যে, স্কুলে শিক্ষকদিগকে অনেক তোষামোদ ও সাধ্যসাধনা করিয়া ভবেশ এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত প্রমোশন পাইয়াছিল। বোধ হয়, এতদিনে তাহার লেখাপড়ার সাধ মিটিয়া থাকিবে; কারণ এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিয়া দুই মাসের মধ্যেই ভবেশ বাড়ীতে সংবাদ দিল যে, তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গের বিশেষ সম্ভাবনা হইয়াছে, চিকিৎসকেরা পরামর্শ দিয়াছেন যে, তাহার পড়া শুনা কিছুদিনের মত বন্ধ করা একান্ত আবশ্যক; যেহেতু মানসিক পরিশ্রমে রোগ বৃদ্ধি হইতে পারে। ভবেশের পিতা (তখন জীবিত ছিলেন) উত্তরে লিখিলেন—'বাবা! তোমার অসুস্থতার সংবাদে বড়ই চিন্তিত হইলাম। তুমি পত্রপাঠ বাড়ী চলিয়া আসিবে। কিছুদিন এখানে থাকিয়া শরীর

সুস্থ হইলে পড়া শুনা করিও।' ভবেশ বাড়ী চলিয়া আসিল। তাহার শরীরে বাহ্য রোগলক্ষণ কেহই দেখিতে পায় নাই; কিন্তু জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিত,—রোগটা মস্তিষ্কের। রোগের সম্পূর্ণ উপশম হইয়াছিল কি না প্রকাশ নাই, কিন্তু ভবেশ আর পড়া শুনা করিল না। সে বাড়ীতেই রহিল। কাজের মধ্যে টেড়ীটা কাটিত এবং সমবয়স্কদিগের এক আড্ডায় সর্ব্বদা ক্রীড়া কৌতুকে সময়ক্ষেপ করিত। ক্রমে তাহার বদখেয়ালে অনুরক্তি জন্মিল এবং সে নেশা করিতেও শিখিল। ভবেশের কুড়ি বৎসর বয়ঃক্রমকালে এক কন্যা জন্মিল, তাহার নাম রাখা হইল বিমলা। বিমলার জন্মের পর বৎসর ভবেশের পিতার মৃত্যু হওয়ায়, সংসারের ভার ভবেশের স্কন্ধে পড়িল। মাতা, স্ত্রী ও কন্যাকে লইয়া, তাহার পরিবার; সুতরাং তৎকালে ক্ষুদ্রই ছিল।

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় বৃত্তি পাইয়া হরিচরণ এল-এ পড়িতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। হরিচরণের পিতার অবস্থা বড় ভাল ছিল না। জমির আয় এবং কৃষিলব্ধ শস্যে সংসার-যাত্রা একরূপ সচ্ছলভাবে নির্ব্বাহিত হইত। কিন্তু তিনি কিছু ঋণ রাখিয়া গিয়াছিলেন। পিতৃশ্রাদ্ধ সমাপনান্তে আয় ব্যয় ও দেনা হিসাব করিয়া হরিচরণ বুঝিলেন যে, অতঃপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। বিশেষতঃ উত্তমর্ণেরা টাকার জন্য বড় পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। সুতরাং এল-এ পাস করিয়াই হরিচরণ অনিচ্ছায় কলেজ ত্যাগ করিলেন। তাঁহার অধ্যবসায় ও সচ্চরিত্রতার হেতু শীঘ্রই কলিকাতার কোন গবর্ণমেণ্ট

আফিসে তাঁহার চল্লিশ টাকা বেতনে একটী চাকরী জুটিল। সেই চাকরীর এবং জমির আয় হইতে হরিচরণের সংসার ব্যয় নির্ব্বাহ এবং অল্পে অল্পে পৈতৃক ঋণ পরিশোধিত হইতে লাগিল। হরিচরণের মাতা অহরহঃ পুত্রের গুণগ্রামের কথা শুনিয়া আপনাকে ধন্যা মনে করিতেন। এক্ষণে তাঁহার সুবুদ্ধি ও সাংসারিকতা দেখিয়া পরম আহ্লাদিতা হইলেন এবং একান্তে ইষ্টদেবতার নিকট পুত্রের দীর্ঘজীবন ও সুখসাচ্ছন্দ্য কামনা করিতে লাগিলেন।

আফিসে হরিচরণের চাকরী হওয়ার কিছুকাল পরে হরিচরণ একদা ছুটীতে বাড়ী আসিলে মাতা বলিয়াছিলেন—"বাবা! ভগবানের ইচ্ছায় তোমার কর্ম্মটুকু হয়েচে, এখন আর আমাদের ভাবনা কি? তুমি বিবাহ ক'রে সুখের সংসার পাতাও; আমি বৌমা ও পৌত্রের মুখ দেখে শেষ জীবনের সাধটা পূর্ণ করি।" হরিচরণ সস্নেহে উত্তর দিয়াছিলেন—'মা, এতদিন যখন গিয়াছে, তখন আরও দুটো দিন যাক। মনে করিচি যে, ঋণদায় থেকে যতদিন মুক্ত হ'তে না পা'রব, ততদিন বিবাহ ক'রব না। আর দুই বৎসরের মধ্যে সমুদয় দেনা পরিশোধ হয়ে যাবে; ভারটা নেবে গেলে তখন মনের সুখে সংসারে প্রবেশ কত্তে পা'রব।' মাতা এই সরল বচনের সমীচীনতা উপলব্ধি করিয়া প্রহৃষ্টা হইলেন। তিনি বিবাহের জন্য পুত্রকে আর পীড়াপীড়ি করেন নাই। হরিচরণের একবিংশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময় সমুদয় ঋণ পরিশোধিত হইল। তাঁহার মাতার আনন্দের আর সীমা রহিল না। এতদিনে প্রাণাধিক পুত্রের

বিবাহ দিয়া মনের প্রধান সাধ পুরাইবার সুযোগ হইল, পুত্রবৎসলা মাতার ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি হইতে পারে? সেই বৎসরেই কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কোন পল্লীর এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির কন্যার সহিত হরিচরণের বিবাহ হইয়া গেল। হরিচরণের শ্বশুর কলিকাতার কোন হৌসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন; তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেন। বিবাহে হরিচরণ মূল্যবান্ দানসামগ্রী এবং অনেক টাকা পণস্বরূপ পাইয়াছিলেন।

হরিচরণ বিবাহ করিয়া বালিকাবধূ মনোরমাকে ঘরে আনিলেন। মাতা আগ্রহাতিশয় সহকারে বধূর অবগুণ্ঠন উন্মোচিত করিয়া দেখিলেন—মূর্ত্তিমতী রূপরাশি! বধূবেশে অশ্রুবিক্তনয়নে সেই একাদশ বর্ষীয়া বালিকার অসামান্য রূপ তৎকালে যেন দশগুণ উচ্ছলিত হইতেছিল। মাতা মুগ্ধ হইয়া বধূকে ক্রোড়ে লইলেন, এবং সস্নেহে মুখচুম্বন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন—'মা, এই আঁধার সংসার আলো ক'রে গৃহিণী হও, সুপুত্রবতী হ'য়ে পরম সুখে সাবিত্রীর মত ঘরকন্না কর, আমি যেন তাই দেখে মরি।' একটী অর্দ্ধ অবগুণ্ঠনবতী বধূ নিকটে দাঁড়াইয়াছিলেন, নববধূকে তাঁহার কাছে রাখিয়া হরিচরণের মাতা স্থানান্তরে গেলে, সেই রমণী হাসিয়া মনোরমার চিবুক ধরিয়া আদর করিলেন এবং পার্শ্ববর্ত্তী একটী ঘরে লইয়া গিয়া সমবেতা পাড়ার মেয়েদের সহিত তাঁহার পরিচয় করিয়া দিলেন। এই রমণী ভবেশের স্ত্রী বিজয়া। বিজয়া ঠাট্টা করিয়া মনোরমাকে বলিলেন—'ভাই, আমি তোমার দিদি হই; সম্পর্কে বড়, সুতরাং

আশীর্ব্বাদ ক'রতে পারি। জ্যেঠাইমার যে আশীর্ব্বাদ, আমারও তাই, তবে বেশী এইটুকু যে, ঘরের গিন্নী নামে না হয়ে কাজে হও। কর্ত্তাটীকে এখন থেকেই অল্পে অল্পে দমন কর্‌তে শেখ।' সকলে হাসিল। মনোরমাও ঘোমটার ভিতর একটু মুচকি হাসিলেন। বিজয়ার কন্যা বিমলা তখন চারি বৎসরের বালিকা ; সে মায়ের সঙ্গে বউ দেখিতে আসিয়াছিল। বিজয়া তাহাকে বলিলেন—'বিমল, তোর খুড়ী মা দেখিচিস্‌ত ? কেমন সোন্দর খুড়ী মা বল্‌ দেখি ?' বিমলার ডাগর চক্ষুদুটী মনোরমার সুন্দর মুখখানি অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখিতেছিল ; সে মায়ের দিকে চাহিয়া সহর্ষবচনে উত্তর করিল, 'বেত্‌ খুলি মা।' সেই মুহূর্ত্তে মনোরমার সহিত বিজয়া ও বিমলার জীবনব্যাপী অকৃত্রিম স্নেহ ও আত্মীয়তার সূচনা হইল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বিজয়া ও মনোরমার প্রণয় কালক্রমে গভীর, স্বার্থশূন্য এবং পবিত্রভাব ধারণ করিল। প্রথম পরিচয়ে তাঁহাদের হৃদয়ে যে বন্ধুতার বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছিল, তাহা সাহচর্য্যে এবং একপ্রাণতায় বদ্ধমূল হইয়া, ক্রমে পত্র-পুষ্প-শোভিত বৃক্ষে পরিণত হইল। সেই স্বর্গীয় তরুর স্নিগ্ধ ছায়ায় বন্ধুদ্বয় বিশুদ্ধ সুখ ও শান্তি উপভোগ করিতে লাগিলেন। তাদৃশ অকৃত্রিম মৈত্রী সংসারে অল্পজনের ভাগ্যেই মিলে।

মনুষ্যমাত্রেরই প্রাণের আকাঙ্ক্ষা বন্ধুলাভ। বন্ধু যথা তথা মিলে না; বন্ধুতায় পদমর্য্যাদা বা ধনসম্পত্তি অন্তরায় হয় না। বন্ধু বন্ধুর সুখে সুখী, দুঃখে দুঃখী হয়, বন্ধুর বিপদে বিপন্ন এবং বন্ধুর ঐশ্বর্য্যে আপনাকে সমৃদ্ধ মনে করে। যে ব্যক্তি প্রকৃত সুহৃদ্‌বৎসল, সে ধনী হইলে প্রিয়তম বন্ধুকে স্বীয় সুখৈশ্বর্য্যের অংশভাগী করিয়া চরিতার্থ হয়। তুমি যাহাকে বন্ধুভাবে হৃদয়ে স্থান দিবে, তাহার সহিত তোমার ঈর্ষা, দ্বেষ, স্বার্থপরতা প্রভৃতি হৃদয়ের নিকৃষ্ট বৃত্তিনিচয়ের সম্বন্ধ এককালে থাকিবে না। তুমি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া সেই মৈত্রীর উদ্দেশে রিপুবিসর্জ্জন করিবে, এবং বন্ধুর সুখ দুঃখ স্বকীয় জীবনে অভিন্নরূপ অনুভব করিবে। স্বার্থ বিসর্জ্জন বা স্বার্থ বিস্মরণ মৈত্রীর প্রধান অঙ্গ। এই স্বার্থ বিসর্জ্জনেই বন্ধুর সুখ; তজ্জন্যই সে লালায়িত, এবং তাহাতেই সে চরিতার্থ হয়। কিন্তু জগতে সহস্র জনের মধ্যে একজনেরও ভাগ্যে এ সুহৃদ্‌লাভ ঘটে কি না, সন্দেহ। সংসারে সকলেই প্রাণের বন্ধু অন্বেষণে ব্যগ্র। অনেকেরই আশা অতৃপ্ত থাকিয়া যায়, কাহারও আকাঙ্ক্ষা অর্দ্ধপূরিত হইয়া নৈরাশে পরিণত হয়; অতি অল্প সংখ্যক নরনারী অবিমিশ্র, স্বার্থ-স্পর্শশূন্য বন্ধুতা সুখ উপভোগ করে। কারণ যে যে অনুকূল গুণ থাকিলে দুইটী মানবজীবন বন্ধুতাসূত্রে পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া একীভূত হয় এবং একের সুখ দুঃখ, আশা ভরসা, সম্পৎবিপদ অন্যের প্রাণে সংক্রামিত করে, সেই সকল গুণের সমাবেশ যুগযুগান্তরে ঘটে কি না সন্দেহ। বন্ধুতা যেন একই আত্মার দুইটী পরস্পর বিচ্যুত

অংশের একত্র সম্মিলন। বিজয়া ও মনোরমার জীবনে এতাদৃশ দুইটী আত্মার মিলন হইয়াছিল।

আমরা খুব সংক্ষেপে বন্ধুদ্বয়ের প্রথম জীবন সংক্রান্ত কয়েকটা ইতিবৃত্ত পাঠকবর্গের সম্মুখে ধরিব।

বিবাহের পর মনোরমা শ্বশুরগৃহে আসিয়া সবে দুইদিন কাটাইয়াছেন, ইতিমধ্যে পাড়ার মেয়েরা তাঁহার সম্বন্ধে বিবিধ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল। নলিনী বলিয়াছিল—“বউটা বড় ঠ্যাকারে; হ’ক না বাপু বড় মানুষের মেয়ে, অত ভাল দেখায় না।” তাহার সমর্থন করিয়া সুকুমারী টিপ্‌পনী কাটিয়াছিল—“আর ভাই, দেখতেই বা এমন ভাল কি? সুন্দরী সুন্দরী ব’লে একটা রব উঠেচে, সুন্দর ত ভারি! বাপের বাড়ীর জল হাওয়ার গুণে, আর ঘ’সে মেজে চামড়াটা কটা হয়েচে, নইলে চোক মুখ কিছু প্রশংসার নয়।” হেমাঙ্গিনী পিট্‌পিট্ সুর ধরিয়াছিল—“না হয় হ’লই বা সুন্দর, কথাগুণো ভাই বড় পাকা। আর অমন বেহায়া ত দেখিনি। ওমা, লজ্জার ধার ধারে না, গুরুজন দেখে ঘোমটা দিতে জানে না! দক্ষিণদেশী মেয়েরা নাকি ওই রকম বেহায়া, কিন্তু আমাদের চখে ভাই ওসব ভাল লাগে না। আমরা যেমন আছি, এই ভাল” ইত্যাদি। প্রকৃতপক্ষে মনোরমা অনিন্দ্য সুন্দরী ও অতীব শান্তস্বভাবা, এবং স্বামী-গৃহে পদার্পণ করিবামাত্র শাশুড়ীর বড় সোহাগের পাত্রী হইয়াছিলেন; সুতরাং পাড়ার মেয়েরা ঈর্ষা-পরবশ হইবে বিচিত্র নহে। তাহারা পূর্ব্বাপর বধূদের খুঁৎকাটিতেই মজবুত, আর পিতৃগৃহের স্বাধীন বায়ু সেবনে দর্পী; সুতরাং নিরীহ

প্রকৃতির বধূগণ তাহাদের সহিত বড় মিশিতে পাইতেন না বা মিশিতে চাহিতেন না। বিজয়া ও মনোরমার প্রগাঢ় বন্ধুত্বের ইহাও একটী প্রধান সহায় হইয়াছিল।

বিজয়া মনোরমার দিদি বলিয়া পরিচিতা হইলেন, এবং অল্পদিনের মধ্যেই নববধূকে সরলতা ও স্নেহ মমতায় তাঁহার একান্ত পক্ষপাতিনী করিয়া ফেলিলেন। বিজয়া স্বভাবতঃ অতীব স্নেহশীলা, মনোরমাকে পাইয়া তাঁহার আনন্দের অবধি রহিল না। মনোরমাও বিজয়ার সহৃদয়তার পরিচয় পাইয়া সোদরার ন্যায় তাঁহাকে হৃদয়ে স্থান দিলেন। উঠিতে বসিতে, চলিতে ফিরিতে, তিনি দিদির সঙ্গলাভে উৎসুক। দিদিকে কাছে পাইলেই তাঁহার কেমন একটু সাহস হয়, মনে হয়, যেন তাঁহার শ্বশুরগৃহ কতদিনের পরিচিত। আমরা জানি, মনোরমা শ্বশুরগৃহে একদিনও কাঁদেন নাই; তবে প্রথমে কখন কখন অন্যমনস্ক হইতেন, কিন্তু বিজয়াকে দেখিবামাত্র তাঁহার বিমর্ষতা ঘুচিত।

প্রথমবারে মনোরমা সাতদিন শ্বশুরগৃহে থাকিয়া পিতৃগৃহে গেলেন। হরিচরণের মাতার বড় কষ্ট হইল। হরিচরণও কলিকাতায় আসিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার গৃহ একরূপ শূন্য। এতদিন বৃদ্ধা যে সুখ কল্পনায় উপভোগ করিতেন, যে বালিকামূর্ত্তি মানসপটে আঁকিয়া অশেষ স্নেহে বাঁধিয়া কল্পনায় সুখের সংসার পাতাইতেন, এক্ষণে সেই মূর্ত্তিমতী গৃহলক্ষ্মীকে কিরূপে ছাড়িয়া থাকিবেন? যাহাকে পাইয়া গার্হস্থ্যের এক শূন্য অংশ এতদিনে পূর্ণ হইল, সেই ললামভূতা বধূটীকে নয়নান্তরালে রাখিয়া কিরূপে দিনযাপন করিবেন? বস্তুতঃ

অধিকদিন এরূপে কাটান অসম্ভব হইয়া উঠিল। বিজয়াও মনোরমাকে আনাইবার জন্য বারম্বার বলিতে লাগিলেন। সুতরাং পাঁচ ছয় মাস যাইতে না যাইতে হরিচরণের মাতার বিশেষ অনুরোধে মনোরমা দ্বিতীয়বার শ্বশুরগৃহে আনীতা হইলেন। বিজয়ার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তিনি মনোরমাকে ক্রোড়ে করিয়া ঘরে লইয়া গেলেন, এবং সহর্ষ-বদনে বলিলেন "এস লক্ষ্মীটী, দেখ দেখি তোমার সঙ্গে ঘরে কত আনন্দ ফিরে এল! চোখে জল কেন ভাই, ছি! মুছিয়ে দিই। আর ভাই! তোমাকে শীগ্‌গির যেতে দিচ্চি না।" মনোরমা চাহিয়া দেখেন, সকলেই তাঁহাকে পাইয়া আনন্দিত, সকলেরই মুখে হাসি; অমনি নিজের দুঃখ ভুলিয়া গেলেন, এবং বৃদ্ধা শাশুড়ী ও বিজয়াকে প্রণাম করিয়া ছায়ার ন্যায় বিজয়ার অনুবর্ত্তিনী হইলেন। এবার স্থির হইল, মনোরমা পর্য্যায়ক্রমে দুইমাস শ্বশুরগৃহে, দুইমাস পিতৃগৃহে থাকিবেন।

বিজয়া প্রত্যূষে উঠিয়া মনোরমার কাছে ছুটিয়া আসিতেন, আসিয়া দেখিতে পাইতেন, মনোরমা তাঁহারই প্রতীক্ষায় বসিয়া আছেন। একদা হরিচরণ গৃহে ছিলেন; প্রভাতে বিজয়া আসিয়া দেখিলেন, বালিকাবধূ রীতিভঙ্গ করেন নাই; সে দিবসও অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া নীচের ঘরে তাঁহার অপেক্ষা করিতেছেন। হাসিতে হাসিতে মনোরমা ছুটিয়া আসিয়া দিদির সম্ভাষণ করিলেন। বিজয়া কপট কোপ প্রকাশ করিয়া বলিলেন—'হ্যাঁ লা, তুই আজও ভোরে উঠিচিস? তোর বুঝি রাত্রে ঘুম হয় না? আমি ত বলে

দিইছিলাম, আজ এত সকালে উঠিস না!' মনোরমা ঈষৎ হাসিয়া উত্তর দিলেন—'কি ক'রব দিদি, ঘুম ভেঙ্গে গেলে তোমার মুখটী যেমন মনে পড়ে, আর বিছানায় থা'ক্‌তে পারি না, চোক মুছ্‌তে মুছ্‌তে নেমে আসি।' বিজয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন—'আচ্ছা ভাই, বেঁচে থাকি ত, আর দিন কতক পরে দে'খ্‌ব, কোন্ মুখের টান বেশী।'

মনোরমার চুল খুলিয়া তৈল মাখান, তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া রায়পুকুরে বা একটু দূরবর্ত্তী নদীতে স্নান করিতে লইয়া যাওয়া প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য বিজয়ার একচেটিয়া হইয়াছিল। বিমলা প্রায়ই তাঁহাদের সঙ্গে থাকিত। গ্রামবাসিনীগণ এই তিনটী মূর্ত্তি সর্ব্বদাই একত্র দেখিতে পাইতেন।

দৈনন্দিন সংসার কার্য্য শেষ হইলে বন্ধুদ্বয় মিলিত হইতেন। প্রায়ই বিজয়া মনোরমার কাছে আসিতেন, কখন কখন বা মনোরমা বিজয়ার গৃহে যাইতেন। বিবিধ কথোপকথনে দিন কাটিয়া যাইত;—আদৌ তাঁহাদের পিতা মাতা, ভ্রাতাভগিনী, দেশের বাল্যবন্ধু এবং পিতৃগৃহের কথা হইত, পরস্পরের আত্মীয় স্বজন কে কোথায় কি অবস্থায় আছেন, তাঁহাদের কি নাম, কাহার কি সন্তান ইত্যাদি। বন্ধুতা যতই গাঢ় এবং নিঃস্বার্থ ভাব ধারণ করিতে লাগিল, বন্ধুদ্বয় পরস্পরের কাছে নিঃসঙ্কোচে মন খুলিতে লাগিলেন। এইরূপে দুইটী হৃদয় অভিন্ন হইল, দুইটী প্রাণের মধ্যে সুখ দুঃখের বিনিময় হইতে লাগিল। মনোরমা কালক্রমে জানিতে পারিলেন যে, বিজয়া অন্তরের নিভৃত প্রদেশে এক গভীর দুঃখ পোষণ করিতেছেন,—ভবেশের দুশ্চরিত্রতা ও অকর্ম্মণ্যতা

তাহার কারণ। বিজয়া হৃদয়ের দুঃখ মনোরমাকে খুলিয়া দেখাইলেন; মনোরমা দেখিয়া ব্যথিতা হইলেন।

একমাস, দুইমাস করিয়া ক্রমে দুই বৎসর চলিয়া গেল। মনোরমা অনেকবার পিতৃগৃহে গেলেন, অনেকবার শ্বশুরগৃহে আসিলেন। পিতৃগৃহে যতদিন থাকিতেন, বিজয়ার সহিত তাঁহার পত্র লেখালেখি চলিত। বন্ধুদ্বয়ের বিচ্ছেদ এককালে দুই মাসের অধিক দিন স্থায়ী হইত না; কিন্তু এই কাল মধ্যে তাঁহারা পরস্পরকে বহুসংখ্যক পত্র লিখিতেন। প্রত্যেক পত্র তাঁহাদের প্রগাঢ় প্রণয়ের পরিচায়ক। আমরা পত্রগুলি সমগ্র পাঠ করিয়াছি, এবং তাহাদের কোন কোনটীতে প্রকৃত জ্ঞানের কথা পাইয়াছি। এস্থলে বিজয়ার একখানি পত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব।—

"ভাই তুমি ওখানে বড় মনের আনন্দে আছ, শুনে সুখী হ'লাম। তুমি লিখেচ, বাপের বাড়ীর মত সুখের স্থান আর নাই। কথাটী আমার মতে সম্পূর্ণ ঠিক নয়, তবে তোমার বয়সের উপযুক্ত। আমি যখন তোমার মত ছেলে মানুষ ছিলাম, তখন ওই রকমই ভাবিতাম। কিন্তু ভাই, তোমাকে খুলে ব'লতে কি, এখন সংসার সম্পূর্ণ ভিন্ন চক্ষে দেখি। আমি মনে করি, শাকভাত খেয়ে আজীবন স্বামীর ঘর করা বাঞ্ছনীয়, কিন্তু পরমযত্নে বাপের বাড়ী থাকা আমাদের সম্মানের কারণ নয়। স্বামীর সংসারই যে আমাদের এক-মাত্র আশ্রয় ও সুখের স্থান, আর একটু বড় হলে আপনা হতেই তা বুঝতে পা'রবে—শিক্ষার দরকার নাই।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

মনোরমার বিবাহের পর দুই বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। হরিচরণের পদবৃদ্ধি হইয়াছে, তিনি এক্ষণে পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতেছেন। মনোরমার শ্বশুরগৃহে বেশ মন টিকিয়াছে। তিনি চরিত্রবান্ স্বামীর প্রণয়, স্নেহময়ী শ্বাশুড়ীর সোহাগ এবং সোদরাতুল্যা বিজয়ার অকপট বন্ধুতা উপভোগ করিয়া স্বামীগৃহ এক্ষণে আর পরগৃহ বলিয়া ভাবেন না। মনোরমার পিতা কন্যাকে বৎসরের মধ্যে তিন চারিবার স্বগৃহে লইয়া যাইতেন।

ভবেশ এতাবৎকাল বাড়ীতেই ছিল। চরিত্রদোষ এবং আলস্যপ্রিয়তা হেতু সে একরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রমসাধ্য কার্য্যে ভবেশ একবারে নারাজ। তাহার পানাসক্তি উত্তরোত্তর বাড়িয়াছে। পান-সহকৃত আমোদ উৎসবে সে প্রায়ই যোগ দিত। ভবেশ ভাল বাজাইতে পারিত, সুতরাং সে নৃত্যগীতামোদি-দিগের একজন প্রধান সহযোগী হইয়া উঠিয়াছিল।

এতাদৃশ অন্তঃসারশূন্য ব্যক্তি সংসারভার বহনে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইবে, বিচিত্র নহে। উপযুক্ত তত্ত্বাবধান অভাবে বিপুল আয়সম্পন্ন বিষয় অচিরে নষ্ট হইয়া যায়। ভবেশের অযত্নরক্ষিত অকিঞ্চিৎকর সম্পত্তি একটী পবিবারের গ্রাসা-চ্ছাদন কিরূপে নির্ব্বাহ করিবে? এই কারণে এবং অমিত

ব্যয়িতা হেতু ভবেশ অল্পে অল্পে ঋণজালে জড়িত হইতে লাগিল। ক্রমে তাহার সংসার চলা ভার হইয়া উঠিল। ভবেশ দুরবস্থার কথা বুঝিয়াও বুঝিত না, কারণ জানিয়াও প্রতীকারে যত্নবান্ হইত না। বিজয়া কিম্বা ভবেশের মাতা এ বিষয়ে কোন কথা বলিলে, ভবেশ পরুষভাষায় তাঁহাদিগকে মর্ম্মবেদনা দিত। তাহার মেজাজ বড় রুক্ষ হইয়াছিল। একদিন বালিকা বিমলা নাকি আবদার করিয়া বাপের কাছে কি চাহিয়াছিল, কিন্তু ভবেশ তাহাকে কটূক্তি করিয়া প্রহার করে। সেই অবধি বিমলা বাপকে বড় ভয় করিত, এমন কি তাহার কাছে যাইতেও সঙ্কুচিত হইত। ফলতঃ ভবেশের সংসার অশান্তির আগার হইয়া উঠিয়াছিল।

বিজয়া বড় চিন্তিতা হইলেন। ভবেশ-পরিবার এক্ষণে তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সংসারসমুদ্রে এক জীর্ণ তরণীতে ভাসমান। বিজয়া সাহসে বুক বাঁধিয়া সেই জীর্ণ তরীর হাল ধরিয়াছেন। কিন্তু এরূপে আর কতদিন চলিবে? তিনি একদিন ভবেশকে বুঝাইয়া বলিলেন—"দেখ, দোকানদার আর ধারে চা'ল ডা'ল দিতে চায় না। দু'খানি গহনা বাঁধা দিয়ে যে টাকা কয়টী ধার পেয়েছিলাম, তা দেনা শোধ কত্তে প্রায় নিঃশেষ হয়েচে। সংসারের আয় অতি সামান্য, কিন্তু প্রত্যহ নিয়মিত ব্যয় আছে। এখন উপায় কি! তুমি একটা চাকরী অবলম্বন না ক'রলে আমাদের যে পথের ভিখারি হ'তে হয়!" ভবেশ বিরক্ত হইয়া বলিল—"তা আমি কি ক'রব? আজ কাল যে সময় পড়েচে, লোকে মাথা খুঁড়েও চাকরী পাচ্চে না। তোমাদের কি, মুখের কথা বইত নয়, বল্লেই হ'ল! তোমরা

ঘরে ব'সে খাবে, আর আমরা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার ক'রে তোমাদের খাওয়াব,—তার ওপর আবার চোখ রাঙানি আছে! কে আর বাপু চাকরীর উদ্দেশে ছুটে বেড়ায়, কেউ ত আর আমার জন্মে চাকরী তৈয়েরি করে রাখেনি। এমনি করে যে ক'দিন হয়, চ'লবে।" বলা বাহুল্য, এতাবৎকাল ভবেশকে একমুহূর্ত্তের জন্যও মাথার ঘাম পায়ে ফেলিতে হয় নাই, সে ভারটা বিজয়ার উপরই ছিল। শান্তশীলা বিজয়া ভবেশের এই অসার বচনে মনে মনে ক্ষুণ্ণ ও বিরক্ত হইলেন; একটু ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন—"গহনা বেচে কি সংসার চলে? তুমি পুরুষ মানুষ, এই সামান্য সংসারের ভারটা যদি তোমার অসহ্য বোধ হয়, তবে আগে ভেবে বিবাহ করা উচিত ছিল। এখন সংসারী হয়েচ, তুমি থা'কতে আমরা অনাহারে কেন মরিব?" ভবেশ চটিয়া বলিল—"অত কথায় তোমার কাজ কি? এখানে তোমার যদি কষ্ট হয়, তা'হ'লে অবাধে বাপের বাড়ী যেতে পার। তোমাকে ত কেউ ধরে রাখেনি!" বিজয়া চুপ করিলেন। হয়ত তাঁহার উত্তরটা কিছু রূঢ় হইয়া থাকিবে, মনে করিয়া সতী একটু অনুতপ্তা হইলেন।

মানুষ প্রিয়তম বন্ধুকে নিজ সুখবার্ত্তা নিবেদন করিয়া যেমন দ্বিগুণতর সুখী হয়, তেমনি আবার দুঃখের অংশভাগী করিয়া কথঞ্চিৎ শান্তিলাভ করে। যে রজনীতে বিজয়া ও ভবেশের উল্লিখিত কথোপকথন হইয়াছিল, তাহার পরদিবস অনেক বেলা পর্য্যন্ত বিজয়াকে আসিতে না দেখিয়া মনোরমা স্বয়ং দিদির গৃহে উপস্থিত হইলেন। ভবেশ গৃহে ছিল না।

ভবেশের মাতা রন্ধনশালায় রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা। তাঁহার মুখে বিজয়ার অসুস্থতার সংবাদ শুনিয়া মনোরমা ব্যস্তসমস্ত ভাবে বিজয়ার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন। বিজয়া বিমর্ষবদনে শয়ন করিয়া ভাবিতেছিলেন। মনোরমাকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া উঠিয়া বসিলেন এবং বলিলেন—"অসুখ হয়েচে বলে আজ ভাই যেতে পারিনি। বিমলাকে তোর কাছে পাঠাচ্ছিলাম।"

মনোরমা—"কি অসুখ দিদি?"

ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাত করিয়া বিজয়া বিষণ্ণবদনে বলিলেন—"এ অসুখের যে কবে শেষ হবে, তা কে ব'লবে! মনের অসুখের কি চিকিৎসা আছে?"

মনোরমা (ব্যগ্রভাবে)—"কেন, কি হয়েচে?"

বিজয়া বিগত রজনীর কথা আদ্যোপান্ত বিবৃত করিয়া বলিলেন—"একে সংসারের ভাবনা, তার ওপর তাঁকে কাল কি ব'লতে কি ব'লে মনঃকষ্ট দিয়িচি। সেই জন্য আজ মনটা বড় খারাপ হয়েচে। সংসারে থেকে স্বামীকে মনঃকষ্ট দেওয়ার চাইতে মরণ ভাল।"

বিজয়ার প্রকৃত অসুখ কি, কেবল মনোরমাই জানিলেন।

মনোরমা বিষাদভরে কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া বিজয়াকে বলিলেন—"দিদি, যাতে সংসারটা চলে তা'র যেমন হ'ক একটা বিধান কত্তে হবে। উপায় কিছু ঠাওরাতে পেরেছ কি?"

বিজয়া—"ভাই, উপায় ত কিছুই ভেবে স্থির কত্তে পাচ্চিনা। আমরা মেয়েমানুষ, এসব বিষয় আমরা কি বুঝি বল। যে রকম সময় পড়েচে, আর ওঁর যে রকম স্বভাব দেখচি, তাতে নিজের চেষ্টায় চাকরী হওয়া অসম্ভব। তা

ভাই আমার বোধ হয়, তোর বাপকে ধ'রলে তাঁর আপিসে একটা চাকরী করে দিতে পারেন। তিনি ত এমন অনেকের উপায় করে দিয়েচেন।"

মনোরমা (সহর্ষে)—"দিদি, ঠিক বলেচ! এমন সুবিধা থা'কতে আমরা মিছা ভেবে মরচি। আমি এখনই বাবাকে চিটি লিখিগে।"

বিজয়া হাসিয়া বলিলেন—"ভাই সেই সঙ্গে ঠাকুরপোকেও একখানা চিটিতে সকল কথা খুলে লিখে বলিস, যেন তোর বাপের সঙ্গে দেখা করে, যা'তে আমাদের একটা উপায় হয় তা করেন। তিনি যেমন আমাদের ব্যথার ব্যথী এমন ত আর কেউ নয়।"

মনোরমা সেই মুহূর্ত্তে পিতাকে ও হরিচরণকে পত্র লিখিলেন। পিতার পত্রে উপসংহারে লিখিয়াছিলেন—"বাবা, আজ যে অনুরোধটী ক'রলাম, তা আমার নিজের এবং ছেলে মেয়ের অন্নের জন্য করিচি, এইটী মনে করো।"

অল্পদিনের মধ্যেই মনোরমার পিতার আপিসে ত্রিশ টাকা বেতনে ভবেশের একটী চাকরী জুটিল। বিজয়া, মনোরমা ও হরিচরণের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। বিজয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে মনোরমার দীর্ঘায়ুঃ ও সুখ কামনা করিয়া বলিলেন—"বোন, আজ তোকে কি বলে আশীর্ব্বাদ ক'রব জানি না; তোর কৃপায় বুঝি এতদিনে অন্ন কষ্ট ঘুচিল।" মনোরমা অভিমানভরে ওষ্ঠ ফুলাইয়া অনুযোগ করিয়াছিলেন—"দিদি, আমি বুঝি তোমার পর, তাই অত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কচ্চ?"

ভবেশ গৃহত্যাগে বিশেষ অনিচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিল, অবশেষে অনেক সাধ্য-সাধনায় বিরক্তির সহিত কলিকাতায় আসিয়া কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইল। হরিচরণ ও ভবেশ এক বাসায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ভবেশের চাকরী হইলে, সরলা বিজয়া মনে করিয়াছিলেন, বুঝি এতদিনে তাঁহাদের সকল দুঃখ দূর হইল। এক বিষম দুশ্চিন্তার ভার অন্তঃকরণ হইতে অপনীত হওয়ায়, তিনি যে সুখ উপভোগ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত। বন্দীকে নিগড় উন্মোচন করিয়া স্বাধীনতা দিলে তাহার যে সুখ, দীর্ঘকাল পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গমকে মুক্তি দিলে গগনমার্গে বিচরণ করিয়া তাহার যে সুখ, তাদৃশ এক অনির্ব্বচনীয় সুখে বিজয়ার হৃদয় আপ্লুত করিয়াছিল। স্বামীকে বিদায় দিবার সময়, সতী অশ্রুপূর্ণলোচনে বলিয়াছিলেন,—'এতদিন কাছে ছিলে; অন্নকষ্ট ভোগ ক'ল্লেও সর্ব্বদা প্রাণভরে তোমাকে দেখতে পেতাম, তা'তে ক্ষুধাকষ্ট অনেকটা ভুলে যেতাম। সে সুখভোগ এখন ভাঙ্গল। ভগবান অন্নকষ্ট দূর কল্লেন, কিন্তু তার চাইতে সহস্রগুণ অধিক আর এক কষ্ট দিলেন! কতদিন যে এ যন্ত্রণা সহ্য হ'বে জানিনা। যাহ'ক খুব সাবধানে থেক, এবং মাঝে মাঝে একখানি ক'রে চিঠি লিখে আমাদের নিশ্চিন্ত রেখ। আর দয়া ক'রে সুবিধামত

দেখে যেও। আমরা তোমার আশা-পথ চেয়ে রইলাম।' বিমলা স্নেহময়ী মাতার অঞ্চল ধরিয়া কাছে দাঁড়াইয়াছিল, তাহার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। ভবেশেরও মন তৎকালে বিচলিত হইয়াছিল।

তাহার পর দেখিতে দেখিতে আরও চারি বৎসর অতিবাহিত হইল। ইতিমধ্যে ভবেশের এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়া পরিবার বৃদ্ধি করিয়াছে। তাহার নাম হইয়াছে ধীরেন্। ধীরেন্ এক্ষণে প্রায় চারি বৎসরের বালক। হরিচরণের মাতা পৌত্রমুখ দর্শনে একান্ত লালায়িত হইয়াছিলেন, তাঁহার সে সাধ সম্প্রতি পূর্ণ হইয়াছে। দুই বৎসরের এক শিশু পুত্র মনোরমার অঙ্ক শোভিত করিয়া পিতা, মাতা এবং পিতামহীর অশেষ হর্ষ বর্দ্ধন করিয়াছে।

হরিচরণ এক্ষণে ৭০৲ টাকা বেতন পাইতেছেন; ভবেশ পাইতেছে ৩৫৲ টাকা,—তাহার পাঁচ টাকা বেতন বৃদ্ধি হইয়াছে।

কিন্তু ভগবান বিজয়ার ভাগ্যে সুখভোগ লেখেন নাই। ভবেশ নম্র চরিত্রের লোক, কলিকাতার অগণ্য প্রলোভন তাহার পক্ষে অপরিহার্য্য হইয়া উঠিল। ইন্দ্রিয়সেবীর ইন্দ্রিয় চরিতার্থতার, মদ্যপায়ীর পান-পিপাসা পরিতৃপ্তির এ হেন সুযোগ আর কোথায় মিলিবে? কলিকাতায় পাপমার্গ অহরহঃ উন্মুক্ত আছে, যাহার ইচ্ছা, অবাধে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে। উচ্ছৃঙ্খলতাকে যে জীবনের সঙ্গী করিতে চায়, আপাতমধুর মরীচিকাবৎ অসার রঙ্গরস যে জীবনের শ্রেষ্ঠ ভোগ্য মনে করে, এবং মদমত্ত হইয়া কুৎসিত বৃত্তি নিচয়ের

চরিতার্থতার জন্য উৎসুক হয়, তাহার নিমিত্ত এই উন্মার্গ সর্ব্বদা উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। পাপের কিঙ্করীগণ কুহকজাল বিস্তার করিয়া ইতস্তত: বিচরণ করিতেছে, এবং পাপকারী-দিগকে অহরহঃ প্রলোভনে মত্ত করিয়া, পরিশেষে তাহাদের সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছে। অহো, সে পরিণাম অবশ্যম্ভাবী! কোটীপতিই হউক, বা পর্ণকুটীরবাসী ভিক্ষুকই হউক, রিপু-সেবীদিগের একই দশা। রিপুবশে মানুষের সদসজ্জ্ঞান লুপ্ত হইয়া পশুত্ব জন্মে; দয়া, ধর্ম্ম, সামাজিকতা প্রভৃতি উচ্চ মনোবৃত্তি বিবর্জ্জিত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে মানব কাম, ক্রোধ, হিংসা, নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা, অশ্লীলতাদি জঘন্য বৃত্তির বশীভূত হয়। কঠিন পরীক্ষা! ভীষণ সমস্যা! সম্মুখে দুইটী পথ রহিয়াছে, তুমি কোন্ পথে যাইবে? এই নিত্য উন্মুক্ত, সুপ্রশস্ত, সহজগম্য, প্রারম্ভদীপ্ত নিরয়ের পথে,—না ঐ সঙ্কীর্ণ, স্তব্ধ, প্রশান্ত, ক্ষীণালোক-প্রতিভাত পুণ্যপথে? পথিক, সাবধান! প্রলোভনে মজিও না! পাপমার্গ মহা-ভয়সঙ্কুল। এপথে যতই অগ্রসর হইবে, ততই ঘনান্ধকারে পথহারা হইয়া পঙ্কে গাঢ়তর মগ্ন হইতে থাকিবে; শেষে দেখিবে, তোমার সম্মুখে উন্মুক্তদ্বার নরক! কিন্তু ঐ যে স্তিমিতালোক-প্রদর্শিত পুণ্যপথ দেখিতেছ, উহাতে কোন ভয় নাই;—ঐ পথে পর্য্যটন কর, সুখ, শান্তি, স্বর্গ মিলিবে।

ভবেশ পাপ-প্রলোভনে মজিল। অল্পদিনের মধ্যেই তাহার কুসঙ্গী জুটিল। সে প্রথমে কিছুকাল নিয়মিত সংসার খরচ পাঠাইতেছিল, এবং সুবিধামত হরিচরণের সহিত বাড়ীও যাইতেছিল। কিন্তু কদাচারে তাহার আসক্তি যতই বাড়িতে

লাগিল, ততই তাহার সাংসারিক কর্ত্তব্যে অধিকতর শৈথিল্য দৃষ্ট হইল। হরিচরণ সব দেখিয়া শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। তিনি যুক্তিপূর্ণ উপদেশে, কখন কখন বা ভৎর্সনা-বাক্যে ভবেশকে সুপথে আনিতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইয়াছিল। কিছুদিন বাহ্য সততা দেখাইয়া দুর্ব্বৃত্ত পুনরায় অল্পে অল্পে সন্নীতির সীমা অতিক্রম করিল। হরিচরণ অবশেষে মনোরমাকে সকল কথা লিখিলেন।

ভবেশ-পরিবার একমাস দুইমাস করিয়া ইদানীং প্রায় এক বৎসর কাল, তাহার নিদারুণ উপেক্ষায় মর্ম্মপীড়িত হইয়াছে। ভবেশ, বিবিধ বিধানে নিরপরাধ পরিবারবর্গকে দুঃখকষ্ট-নিপীড়িত করিয়া, নিষ্ঠুরতার চরম পরিচয় দিয়াছে। চারিটী অসহায় প্রাণীর জীবনরক্ষার ভার তাহার হাতে, কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত সেই পবিত্র দায়িত্ব হেলায় পায়ে ঠেলিয়াছে। বিজয়া আশাপথ চাহিয়া চাহিয়া কেবল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়াছেন, এবং মর্ম্মবেদনায় নির্জ্জনে অশ্রুমোচন করিয়াছেন। ভবেশ আর তাঁহার পত্রের উত্তর দেয় না; সম্প্রতি কয়েকমাস সংসারের খরচ পাঠায় নাই। বিজয়া যেন অকূলপাথারে ভাসিতে লাগিলেন। তিনি প্রকৃত ঘটনা আভাসে বুঝিয়াছিলেন, তথাপি কি এক অমঙ্গলের আশঙ্কা তাঁহার চিত্ত আন্দোলিত করিল। মনোরমা স্বামীর পত্রে ভবেশের দুশ্চরিত্রতার কথা শুনিয়া বড় মনোবেদনা পাইয়াছিলেন, কিন্তু বিজয়াকে ঘুণাক্ষরেও তাহা জানিতে দেন নাই। এক্ষণে বিজয়াকে স্থির রাখা অসম্ভব দেখিয়া, বাধ্য হইয়া

তাঁহাকে হরিচরণের পত্র পড়িতে দিলেন। পত্র পাঠ করিয়া বিজয়া মনোরমার ক্রোড়ে মুখ রাখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। মনোরমা তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া কত বুঝাইলেন। বিজয়া কেবলমাত্র বলিলেন—'ভাই, এই যন্ত্রণাভোগ কপালে ছিল ব'লে, কি এত সাধ্যসাধনা ক'রে তাঁ'কে বিদেশে অর্থ উপার্জ্জন কত্তে পাঠাইয়াছিলাম?' ভবেশের বৃদ্ধা মাতা শুনিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

শনিবার। দুইটার সময় আফিস বন্ধ হইয়াছে। ভবেশ নেশা করিয়া সন্ধ্যার সময় বাসায় আসিলে, হরিচরণ তাহার হাতে একখানি পত্র দিলেন। ভবেশ পত্র পাঠ করিল; তাহার মাতা লিখিয়াছেন ঃ—

"বাবা, তুমি অনেকদিন কোন চিঠিপত্র লেখনি, আর বাড়ীও এসনি, আমাদের বড় ভাবনা হ'য়েছিল। হরির চিটিতে শু'নলাম, তুমি ভাল আছ, শুনে নিশ্চিন্ত হ'লাম। বাবা, তোমাকে অনেকদিন দেখিনি, যত শীঘ্র হয়, একবার বাড়ী আসিবে। যে দু'পয়সা খাজনার আয় আছে, তা কোনরূপেই আদায় হচ্চে না। তুমি বাড়ী এসে তা'র একটা বন্দোবস্ত ক'রবে। সংসার খরচ অনেকদিন পাঠাওনি, আমাদের বড় কষ্ট হ'য়েচে। খরচ শীঘ্র পাঠাবে, নতুবা সংসার চলে না।

"আর একটা কথা লিখি। বিমলের বিবাহ শীঘ্র না দিলে, আর ভাল দেখায় না। মেয়ে বড় হয়েচে, লোক্‌-নিন্দা হ'বে। এখানে রাম মুখুয্যের ছেলে বিপিনের সঙ্গে বিমলের বিয়ের প্রস্তাব করিচি। তাঁরা বিমলকে পছন্দ করেচেন, কিন্তু পাঁচ শ টাকা চা'ন। অনুরোধ উপরোধে টাকাটা কিছু ক'মতে পারে। তুমি না আসা পর্য্যন্ত এ বিষয়ের কিছু স্থির কত্তে পাচ্চি না। বিপিনের অনেকগুলি সম্বন্ধ এসেছে; একটু তৎপর হয়ে চেষ্টা না ক'রলে ছেলে হাত ছাড়া হয়ে যাবে। বিবাহের টাকার সংস্থান এখন থেকেই করা চাই। এ বিষয়টা বিশেষ মনোযোগ করো। বিমল কুলীনের মেয়ে, এবং আমাদের অবস্থা সামান্য; তবু বিমলকে সুপাত্রে দেওয়াই আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য, এবং তার সাধ্যমত চেষ্টাও ক'রতে হ'বে।

তোমার মাতা।"

হরিচরণ জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভবেশ, খুড়ীমার চিটি বুঝি? কি লিখেচেন, বাড়ীর সব ভাল ত?"

ভবেশ বিদ্রূপাত্মক স্বরে উত্তর দিল,—"কি আর লিখবেন বাবা,—সেই এক কথা,—খরচ পাঠাও, বাড়ী এস, আর মেয়ের বিয়ের চেষ্টা কর। আর কি লেখবার কিছু আছে!"

হরিচরণ একবারে ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং ঘৃণা-ব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন,—"ধিক্ ভবেশ, তুমি পশুরও অধম! খুড়ীমা যে কয়টী বিষয় লিখেচেন, তা তুমি বিদ্রূপের কথা মনে কর! যদি তুমি মানুষ হ'তে, তা হ'লে বুঝতে পারতে যে, তোমার, আমার এবং সকল মানুষের জীবনে ওই

কয়টীই সর্ব্বপ্রধান, এবং পবিত্রতম দায়িত্ব-পূর্ণ কার্য্য। ছি, ছি! তুমি মায়া মমতায় একবারে জলাঞ্জলি দিয়েচ! বাড়ী যেতে চাও না, পরিবারদের কোন খবর লও না, সংসারের খরচ পাঠান বন্ধ করেচ। কেন তোমার এরূপ মতিভ্রম হ'ল? তুমি একদণ্ডের জন্যও ভেবে দেখ না যে, যে পথে তুমি পা দিয়েচ, তার কি ভীষণ পরিণাম!" হরিচরণ মুহূর্ত্তকাল চুপ করিয়া, পুনরায় উত্তেজনার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভবেশ! বিমল বড় হয়েচে, তা'র বিবাহের কথা কখনও ভাব কি?"

ভবেশ ঈষৎ হাসিয়া বলিল—"আরে, মেয়ের বিয়ের জন্য আমি ভাবিনা, যা হয় হ'বে। যে কটা দিন বাঁচি, ফূর্ত্তি ক'রে নেওয়া যাক্। তোরা যত মূর্খের দল বইত নয়, বাজে ভাবনায় নিজেও কষ্ট পাবি, সময়ে সময়ে আমাদেরও আয়েশে বাদ সাধবি।"

ভবেশকে অপ্রকৃতিস্থ দেখিয়া, হরিচরণ থামিলেন।

সন্ধ্যা হইল। হরিচরণ রাত্রি ৯টার ট্রেণে বাড়ী যাইবেন, তাহার আয়োজন করিতেছিলেন। তিনি ভবেশকে মৃদুবচনে আর একবার বলিলেন—"ভবেশ! খুড়ীমা তোমাকে বাড়ী যেতে লিখেচেন, বিশেষ তুমি অনেকদিন বাড়ী যাওনি,—তোমার একবার যাওয়া একান্ত দরকার। ভেবে দেখ দেখি, কতদিন খরচ পাঠাওনি, বাড়ীতে তাঁরা কত কষ্টে পড়েচেন! সংসারের একটা শৃঙ্খলা করা তোমার কর্ত্তব্য। আজ মাহিনা পেয়েচ, আমার সঙ্গে বাড়ী চলনা কেন?" ভবেশ চক্ষু টানিয়া ব্যঙ্গস্বরে উত্তর করিল,—"আমাদের ভাই অল্প মাইনের

চাকরী, খরচ ক'রে বাড়ী যাওয়া কি আমাদের পোষায়! তোমরা অনায়াসে পার।"

হরিচরণ ঘোর বিরক্তির সহিত বলিলেন,—"ওসব উন্মত্তের প্রলাপ শু'ন্‌তে চাইনা! তোমার বাড়ী যাওয়ার অর্থ সঙ্কুলান হয় না, কিন্তু কুক্রিয়ায় অর্থ জোটে কিরূপে? তোমার চাকরীতে যদি পরিবারদের অন্নকষ্ট না ঘু'চল, তবে সে চাকরী থাকার প্রয়োজন কি? এখানে অধঃপাতে যা'বার জন্য তোমার চাকরী হয়নি।"

ভবেশ কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিল,—"তোমাদের অনুগ্রহে চাকরীটুকু পেইচি, বড় জোর না হয় তা' কেড়ে নেবে।"

হরিচরণ (হতাশ-ভাবে)—"চাকরী যা'বে সেও ভাল, তবু বদখেয়াল ছাড়বে না! কি ভয়ানক! বাড়ীতে পরিবারেরা অনশনে দিন কাটাচ্চে, ভুলেও তা একবার ভাব না!"

ভবেশ—"কে ব'ললে, অনশনে দিন কাটাচ্চে? সব মিথ্যা। হরি, তুমি ওসব কথা বিশ্বাস ক'রো না। আর আমি ত এ পর্য্যন্ত সমানেই খরচ পাঠিয়েচি, কেবল এই দু'মাস নিজের একটা দেনা শোধ কত্তে হয়েচে বলে টাকা পাঠাতে পারিনি। আমার যেমন সাধ্য, তেমনি সাহায্য করি। আসল কথা, ওঁদের চাল বড় হয়ে পড়েচে; যেমন অবস্থা, তার অতিরিক্ত খরচ কত্তে চান। কাজেই যত দাও, কিছুতেই মন উঠে না। সামান্য সংসার, জমি-জমার আয় থেকে খরচ চ'লে যাওয়ার কথা। কি জান, (ঈষৎ হাসিয়া) ওঁরা বাইরে যতটা দেখান, আসল তা কিছুই নয়।"

হরিচরণ—"বৃথা বাক্যে কাজ নাই। ভাই, আমি বিনীত-ভাবে আর একবার অনুরোধ কচ্চি, তুমি বাড়ী চল। নতুবা আমি বড় অসুখী হ'ব। তোমার বাড়ীর সকলে তোমার প্রতীক্ষা ক'রচেন, তুমি না গেলে তাঁদের কি ব'লব?"

ভবেশ—"কি বিপদ, আমি কি বলচি বাড়ী যা'ব না? আজ তোমার সঙ্গে যেতে পা'রলাম না, কিন্তু শীঘ্রই একবার যা'ব। মাকে এই কথা বলো।"

হরিচরণের মুখ গম্ভীর হইল। তিনি ক্ষুণ্ণভাবে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সংসার খরচের টাকা আমার সঙ্গে পাঠাবে কি?" ভবেশ বলিল,—"আমার এখানকার খরচ বাদে যা থাকে, আমি বাড়ী যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে যাব।"

ভবেশ বেশ-বিন্যাস করিয়া তাড়াতাড়ি বাহির হইল। তাহার মস্তকে সুন্দর টেড়ি, পরিধানে ধপ্‌ধপে কোঁচান কাপড়, বস্ত্রে এসেন্সের সৌরভ। হরিচরণ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, বিষাদভরে বলিলেন—"ভবেশ, অধঃপাতে যেতে বসেচ! তোমার আর কিছুতেই উদ্ধার নাই। তবে তুমি আপনার লোক, দেখে বড় কষ্ট হয়; তাই বার বার নিষেধ করি, এবং সুপথে আ'নতে চেষ্টা করি। এখনও ভেবে দেখে ফের। ন'ইলে মহা কষ্টে প'ড়বে!" ভবেশ অবজ্ঞাসূচক একটা বিকট হাস্য করিয়া বাহির হইল। তাহার পকেটে টাকার ঝঙ্কার হরিচরণ শুনিতে পাইলেন।

হরিচরণ শিয়ালদহ ষ্টেশনে ট্রেণে উঠিলেন। ৯টার সময় ট্রেণ ছাড়িল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

গাড়ীতে বসিয়া হরিচরণের মনে বিষাদ চিন্তা জাগরূক হইতে লাগিল। ট্রেণ ছুটিতেছে, তিনি একটী প্রকোষ্ঠে একাকী বসিয়া আছেন। পূর্ণচন্দ্রের শুভ্র-কিরণ ধরণী প্লাবিত করিয়াছে। স্থানে স্থানে বৃক্ষরাজি উভয়পার্শ্বে নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া পত্রশাখা বিস্তার পূর্ব্বক চন্দ্রালোক অবরোধ করিয়াছে। পৃথিবী নিস্তব্ধ; কেবল ট্রেণ সশব্দে ধাবিত হইতেছে।

হরিচরণ ভাবিতেছিলেন—ভবেশের কথা, বিজয়ার কথা, আর মানবজীবনের কথা। সুখচিন্তার পরিবর্ত্তে, বিষাদ-চিন্তা আসিয়া তাঁহার চিত্ত অধিকার করিল। তাঁহার মনে হইল, কুপথগামী মানব, পশু অপেক্ষা অধম। ভগবান্ মনুষ্যকে বিবেক দিয়াছেন, হিতাহিত জ্ঞান দিয়াছেন, পাপের শাস্তি ও পুণ্যের সুখ বিচারের ক্ষমতা দিয়াছেন, তথাপি মানব কেন এরূপ ভ্রমান্ধ? ইহজীবন মানবের পরীক্ষারকাল। পুণ্যপথে চলিলে, এই সংসারেই স্বর্গ, পাপে মজিলে ইহলোকেই নরকভোগ; কিন্তু মানব জ্ঞান থাকিতেও অজ্ঞান,—পতঙ্গের ন্যায় উন্মত্ত হইয়া, পাপবহ্নিতে আত্ম-বিসর্জ্জন করিতে সদাই লালায়িত। হায়! ভবেশের কি কখন সুমতি হইবে? সে কি আর সুপথে ফিরিবে? যাহার পাপ-লালসা এত বলবতী, সে কি কদাচ সংসারধর্ম্মে মন দিবে? অসম্ভব। আহা! কি

পাপে ভগবান্ বিজয়ার ভাগ্যে এ দুঃখভোগ লিখিলেন? বিজয়ার মত সতী, গুণবতী এবং বুদ্ধিমতী স্ত্রী অতি অল্পই দেখা যায়। নির্ব্বোধ ভবেশ জানে না যে, বিজয়াকে নিপীড়িত করিয়া সে প্রকৃতই ঘরের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলিতেছে; সে জানে না যে, এ পাপের কি প্রায়শ্চিত্ত!

চিন্তা-স্রোত অপ্রতিহত প্রভাবে ছুটিতেছিল; পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠে একটী শিশুর ক্রন্দনধ্বনি আচম্বিতে হরিচরণের চিন্তাভঙ্গ করিল। শিশুর কণ্ঠশব্দে তাঁহার পুত্রের কথা মনে পড়িল, অমনি চিন্তাস্রোত ফিরিয়া গেল।

হরিচরণ যখন গ্রামের ষ্টেশনে পৌছিলেন, তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। ভৃত্য আলোক লইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। ষ্টেশন হইতে গৃহ অর্দ্ধ ক্রোশ মাত্র। হরিচরণ ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যদু, বাড়ীর সব ভাল ত রে?" যদু প্রণাম করিয়া বলিল, "আজ্ঞা হাঁ, সব মঙ্গল।"

যদু আলোক লইয়া অগ্রগামী হইল, হরিচরণ পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। তাঁহার মনে যে সকল সুখ কল্পনা উদিত হইতেছিল, তাহা পবিত্র ও স্বর্গীয়। পাঠক! আপনার ভাগ্যে সে সুখাস্বাদ কখন ঘটিয়াছে কি? যদি ঘটিয়া থাকে, তবে আপনি হরিচরণের মনোভাবের উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আপনি সাধু এবং প্রেমিক, সুতরাং নিশ্চয়ই হরিচরণের কল্পনায় সহানুভূতি প্রদর্শন করিবেন; আর (ঈশ্বর না করুন) যদি প্রবাসী হন, তাহা হইলে সে কল্পনায় আত্ম-জীবনের একটী অঙ্কের অভিনয় দেখিয়া হাসিবেন। হরিচরণ মনোরমার চাঁদ মুখখানি একাগ্রচিত্তে ভাবিতেছিলেন। সেই

ফুটন্ত চক্ষু, সেই সুধামাখা হাসি, সেই পৃষ্ঠবিলম্বী কৃষ্ণকেশ, তিনি আত্মহারা হইয়া মানসচক্ষে দেখিতেছিলেন। ওঃ, সে কল্পনায় কি সুখ! তাহার মধুরতা ও একাগ্রতায় প্রণয়ী বাহ্যজগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া যায়। সংসারে যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু বাঞ্ছনীয়, প্রেমিক তাহা একাধারে প্রণয়িনীতে নিহিত দেখে; প্রণয়ী প্রকৃতির সৌন্দর্য্য প্রণয়িনীর সহযোগ ব্যতিরেকে অনুভব করিতে সক্ষম হয় না। পূর্ণচন্দ্র সুধা-বর্ষণ করিতেছে, কিন্তু যতক্ষণ না সেই সুধাতরঙ্গে প্রণয়িনীর দেহযষ্টি বিভাসিত হইবে, এবং তাহার শুভ্রপ্রবাহে প্রিয়ার স্মিতানন মিলিত হইবে, তাবৎ সে পূর্ণচন্দ্র সুষমাহীন। কুসুমের সৌন্দর্য্য ও সুবাস, মলয়ানিলের স্নিগ্ধপ্রবাহ, যখন প্রণয়িনীর স্মৃতি জাগাইয়া দেয়, তখনই প্রকৃত মনোহারী। ইহাই যৌবনের ইন্দ্রজাল, প্রেমিকের স্বপ্নরাজ্য।

হরিচরণ ভাবিলেন, 'হয়ত গিয়া দেখিব, মনোরমা ঘুমাইতেছে, আর খোকা তাহার ক্রোড়ে শুইয়া আছে;— তাহা হইলে ঘুম ভাঙ্গাইব কি? না, না, কাছে বসিয়া, সেই ঘুম ও ছবি দুটী প্রাণ ভরিয়া দেখিব, আর অতি সন্তর্পণে দুইটী চুম্বন করিব। মনোরমার ঘুমন্ত মুখখানি কি সুন্দর।' হরিচরণের মনে হইল, মনোরমা যদি জাগিয়া থাকেন, তবে কি বলিয়া আদর করিবেন? এইবার প্রেমিক একটু সমস্যায় পড়িলেন। অনেক তোলাপাড়া করিয়া, অবশেষে স্থির হইল যে, তিনি মনোরমার সঙ্গে প্রথমে একটু অভিমানের ঝগড়া করিবেন; কিয়ৎক্ষণ কথা কহিবেন না, যেহেতু মনোরমা পত্র লিখিতে বড় দেরী করেন, (হরিচরণ সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার

দুইখানি পত্র পাইতেন); তাহার পর মনোরমা অপরাধ স্বীকার করিয়া ক্ষমা চাহিলে, সকল বিসম্বাদ মিটিয়া যাইবে।

সুখচিন্তায় বিভোর হইয়া, হরিচরণ যাইতেছেন। তাঁহার দৃষ্টি ভূমি-সংলগ্ন। নৈশবায়ু ক্ষণে ক্ষণে সর্ সর্ শব্দে বৃক্ষ-পত্র আলোড়িত করিতেছিল। ক্বচিৎ নীড়স্থিত বিহঙ্গমের পক্ষ সঞ্চালন শব্দ শুনা যাইতেছিল। ক্বচিৎ দুই একটী শৃগাল ভয়চকিতের ন্যায় বন হইতে বনান্তরে ছুটিয়া যাইতেছিল। গ্রাম্য চৌকীদারের 'মা ভৈঃ' রব সুদূরে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর প্রতিধ্বনিত হইতেছিল।

অকস্মাৎ হরিচরণ চমকিয়া উঠিলেন। যেন কাহার মর্ম্মভেদী দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। মস্তক তুলিয়া দেখিলেন, নিকটবর্ত্তী একটী একতল গৃহের উন্মুক্ত বাতায়ন হইতে, একটী রমণী মূর্ত্তি উঠিয়া ধীরে ধীরে গৃহমধ্যে অন্তর্হিত হইল। হরিচরণের চমক ভাঙ্গিল;—দেখিলেন, তিনি ভবেশের গৃহের সন্নিকটস্থ পথ দিয়া যাইতেছেন; সেই দৃষ্ট রমণীমূর্ত্তি বিজয়ার মূর্ত্তি বলিয়া চিনিলেন। বিজয়া উৎসুক চিত্তে ভবেশের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। অভাগিনীর সেই নৈরাশব্যঞ্জক দীর্ঘনিশ্বাস ধ্বনি হরিচরণের কোমল অন্তরে প্রতিধ্বনিত হইল। দারুণ কালিমায় তাঁহার বিমল সুখচিন্তা আচ্ছন্ন হইল। তিনি মনে মনে বলিলেন—"ভবেশ, সতীর দীর্ঘনিশ্বাসে প্রকৃতি সন্তপ্তা ও তোমার গৃহদেবতা রুষ্টা হইতেছেন! অনুতপ্ত প্রাণে বিজয়ার ক্ষমা ভিক্ষা কর, নতুবা এ আগুণে অচিরাৎ পুড়িয়া মরিবে।"

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হরিচরণ বাড়ী পৌঁছিলেন। গৃহপালিত কুকুরটী ঘেউ ঘেউ করিয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই গৃহস্বামীর পরিচিত স্বর শুনিয়া স্থির হইল। হরিচরণের মাতা পুত্রের আগমন প্রতীক্ষায় অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত জাগিয়াছিলেন; অল্পক্ষণ হইল, তাঁহার একটু তন্দ্রা আসিয়াছিল। কুক্কুরের রবে তন্দ্রাভঙ্গ হইবামাত্র, তিনি তাড়াতাড়ি উঠিয়া "বাবা এসেচ" বলিয়া দ্বার খুলিলেন। হরিচরণ অগ্রে ভক্তিভাবে মাতার চরণ বন্দনা পূর্ব্বক আশীষ লইলেন, তৎপরে হস্ত পদ ধৌত করিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন। স্বল্পকাল বিশ্রামের পর মাতা পুত্রকে খাবার দিলেন, এবং কাছে বসিয়া বিবিধ কথোপ-কথন করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্নেহের চক্ষে বোধ হইল, হরিচরণ অপেক্ষাকৃত কৃশ হইয়াছেন; তাই সস্নেহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা, তোমার মুখখানি কাহিল দেখচি কেন? কোন অসুখ হয়নি ত?" হরিচরণ হাসিয়া বলিলেন—"না মা, আমি বেশ ছিলাম।"

মাতা (হাসিয়া)—"তোমার ছেলের জন্যে কি এনেচ বাবা? সে আমাকে ভরসা দিয়েচে যে, বাবা পুঁতুল আ'নলে তার ভাগ আমাকে দেবে। খগেনের খেলনা এনেচ ত?"

হরিচরণ (সস্মিতমুখে)—"হ্যাঁ মা, এনিচি। আর কিছু খাবারও এনিচি।"

মাতা—"তা বেশ করেচ। ছেলে খেতে শিখেচে; খাবার পেয়ে কত আহ্লাদ ক'রবে এখন।"

বৃদ্ধা অতঃপর হাসিতে হাসিতে পৌত্রের নামে এই গুরু অভিযোগ উপস্থিত করিলেন—"বাবা, খোকা বড় দুষ্টু হয়েচে। আজ সকালে তোমার আ'সবার খবর পেয়ে, আমি ব'ললাম—'দাদা, আমার বাবা যে আজ বাড়ী আ'সবে।' তাই না শুনে, 'আমা বাবা' 'আমা বাবা' বলে আমার সঙ্গে কত ঝগড়া ক'রল। খগেন আমার কোল ছেড়ে, আর কারো কোলে থা'কতে চায় না, অথচ তার অত্যাচারে মাথার পাকাচুল গুলি বাঁচান দায়। 'দিদি' 'দিদি' ব'লে কেমন ডাকে!' প্রথমজাত শিশুর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাহিনী এবং তাহার পিতৃপরায়ণতার দুই একটী কথায় যুবক পিতার হৃদয়ে যে সুখসঞ্চার হয়, সম্ভবতঃ পাঠকের তাহা অবিদিত নাই। মাতার মুখে পুত্রের ক্ষুদ্র ইতিহাস শ্রবণ করিয়া, হরিচরণ প্রগাঢ় আনন্দ উপভোগ করিলেন।

মাতা প্রশ্ন করিলেন—"বাবা, ভবেশ এসেচে?"

হরিচরণ মায়ের মুখপানে চাহিয়া, বিমর্ষভাবে মস্তক নাড়িলেন, বলিলেন—"না মা, তা'কে কত বুঝা'লাম, কত সাধ্যসাধনা ক'রলাম, কিন্তু কিছুতেই বাড়ী আ'নতে পা'রলাম না। সে কেমনতর একরকম হয়ে গেছে।"

মাতা শুনিয়া দুঃখ প্রকাশ করিলেন, এবং ভবেশ-পরিবারের দুরবস্থার কথা আনুপূর্ব্বিক পুত্রকে বলিলেন। হরিচরণের জলযোগ শেষ হইল; মাতা বলিলেন—"যা'ও বাবা, শোওগে; রাত্ হয়েচে।"

হরিচরণ শয়নগৃহে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, সোণার প্রতিমা বস্ত্রে বরাঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া পর্য্যঙ্কে শয়ানা; দক্ষিণ হস্তখানি প্রগাঢ় যত্নে শিশু-তনয়কে বেষ্টিত করিয়া আছে। শিশু নিদ্রিত। মাতা নিদ্রিতা কি না, আমরা জানি না। হরিচরণ মৃদুপদবিক্ষেপে শয্যাপার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন; কিয়ৎকাল অনিমেষে সেই অপূর্ব্বদৃশ্য, সেই পবিত্র রূপমাধুরী দেখিতে লাগিলেন; এক স্বর্গীয়সুখে তাহার প্রাণ ভরিয়া গেল। তিনি ধীরে ধীরে প্রণয়িনীর শিরোবস্ত্র উন্মোচিত করিলেন। বুঝি মনোরমার নিদ্রাভঙ্গ হইল; লজ্জাবতী বস্ত্র একটু টানিয়া দিলেন। হরিচরণ ছাড়িবার পাত্র নহেন, তিনি আদর করিয়া পুনরায় মুখাবরণ সরাইলেন। মেঘের অন্তরাল হইতে পূর্ণচন্দ্র যেন হাসিয়া বাহির হইল। হরিচরণের নয়নচকোর পরমসুখে সে সুষমা উপভোগ করিল। হরিচরণ তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন।

তাহার পর যে অভিনয় হইল, তাহার কথঞ্চিৎ আভাস এস্থলে না দিলে, গ্রন্থের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। বিষয়টী অতীব পবিত্র ও অতীব গুহ্য। তাহার আলোচনা করা, অথবা সাধারণের সমক্ষে দৃশ্যটীর অবতারণা করা, নানা কারণে বাঞ্ছনীয় নহে। কেহ বা ইহাতে গ্রন্থকারের অমার্জ্জিত রুচির পরিচয় পাইয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিবেন, কেহ হয়ত তাহাকে অর্ব্বাচীন মনে করিয়া, প্রকাশ্যেই বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করিবেন। কিন্তু নাচার। মনুষ্যের রুচি বিভিন্ন। বর্ণনীয় বিষয়টী গ্রন্থকারের নিকট পরম পবিত্র বোধে অপরিহার্য্য; সুতরাং রুচিসেবী সহৃদয় পাঠক প্রস্তুত হউন।

. হরিচরণ মনোরমার চাঁদ মুখখানি দুই হস্তে ধরিয়া বিম্বোষ্ঠে চুম্বন করিলেন। লজ্জাবতী আস্তে আস্তে উঠিয়া বসিলেন, এবং স্বামীর মুখপানে চাহিয়া একটু হাসিলেন। বুঝি মনোরমা কাজ ভাল করেন নাই; কারণ, সেই ভুবন-ভুলান হাসি অধরপ্রান্তে মিলাইতে না মিলাইতে, দ্বিতীয় চুম্বনে তাহা সজীব হইল। তাহার পর একটী, তাহার পর আরও একটী;—হরিচরণ উপর্য্যুপরি চারি পাঁচবার মনোরমার মুখচুম্বন করিলেন। তাঁহার তৃষিত ওষ্ঠপুট সুধাপানে উদ্দাম ভাবে পুনঃ পুনঃ ধাবিত হইতে লাগিল। কিছুতেই যেন প্রেমিকের প্রাণের তৃষ্ণা মিটিল না। মনোরমা প্রথমে দুই একবার বাধা দিয়া, অবশেষে সেই বিমল প্রেমের স্রোতে গা ঢালিলেন। এইখানে আর এক কথা বলিতে হয়। হরিচরণ নিদ্রিত শিশুর মুখচুম্বনের জন্য সাগ্রহে মনোরমার অনুমতি চাহিয়াছিলেন; মনোরমা বলিয়াছিলেন—"না, আজ আর নয়, তা'হলে খোকার ঘুম ভেঙ্গে যাবে। কাল সকালে যত পার খেও।" আমাদের বোধ হয়, সেটা মনোরমার হিংসার কথা!

এবার ভবেশের কথা উঠিল। মনোরমা জিজ্ঞাসা করিলেন "ভাসুর এসেচেন?" হরিচরণ বলিলেন—"না; সে হতভাগা একবারে অধঃপাতে গেছে; অত্যন্ত বেয়াড়া এবং মাতাল হয়ে পড়েচে; সংসার-ধর্ম্মে আর তার মতি নাই।" বলিতে বলিতে হরিচরণ একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সেই রজনীর ঘটনা,—বিজয়ার সেই হৃদয়-বিদারক নৈরাশ ছবি, বিবৃত করিলেন। মনোরমার মুখে কি যেন একটা বিষাদ ছায়া

পড়িল। তিনি বিমর্ষভাবে স্বামীকে বলিলেন—"আহা, বিজয়া দিদির কি দুঃখের কপাল, কেবল কেঁদে কেঁদে আর দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলে দিন কাটাচ্চেন! ভাসুর বাড়ী আসা দূরে যাক্, সংসারের খরচ পাঠান এক রকম বন্ধ করেচেন! শেষে কি ওঁরা অনাহারে মারা প'ড়বেন! বিমলও বড় হয়েচে, তা'র ত একটা বিবাহ দেওয়া চাই। এখন উপায় কি?"

স্নেহবতী করুণায় গলিয়া গেলেন, স্বামীর হাতখানি নিজ হস্তে লইয়া, বিষাদমিশ্রিত আবদারের সহিত বলিলেন,—"আমি বেঁচে থা'কতে দিদির ওসব কষ্ট চক্ষে দে'খতে পা'রব না। তোমাকে এর উপায় কত্তে হবে। তোমার মত দেবতুল্য লোক চেষ্টা ক'রলে, একটা কুপথগামী লোককে অবশ্যই উদ্ধার কত্তে পারে। এইবার যখন বাড়ী আ'সবে, ভাসুরকে যেমন ক'রে পার সঙ্গে এন, আর যাতে তাঁর সুমতি হয়, সে বিষয়ে সাধ্যমত চেষ্টা ক'রো। বল, আমার অনুরোধ রা'খবে?" হরিচরণ সস্নেহে পুনর্ব্বার তাঁহার মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন—"মনোরমা! আমার চেষ্টার কিছুমাত্র ত্রুটি হইবে না, ঈশ্বর ভবেশের সুমতি দিন।"

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রত্যূষে বিমল ভাইটীকে সঙ্গে লইয়া, তাহার কাকিমার বাড়ীতে খেলা করিতে আসিয়াছে। বিমল একাদশ বর্ষীয়া, মধ্যমাকৃতি এবং স্বাভাবিক একটু কৃশ। তাহার কোমল অঙ্গযষ্ঠি, সুন্দর কান্তি, বিস্ফারিত স্বচ্ছ নয়নযুগল, কপোল-বিলম্বী গুচ্ছ গুচ্ছ কৃষ্ণকেশ, সূক্ষ্মাগ্র নাসিকা এবং মুক্তাসন্নিভ দশন-পংক্তি বড়ই মনোহর। সহস্র ছবির মধ্যে রাখিয়া দাও, বালিকা বিমলার প্রশান্ত মাধুর্য্য সর্ব্বাগ্রে দর্শকের চিত্তাকর্ষণ করিবে। বিমলের হাসিটুকু অতুলনীয়, কিন্তু সচরাচর কেহ সে সুমধুর হাসি দেখিতে পাইত না।

বিমল এইরূপ প্রত্যহ খেলা করিতে আসিত। সে আজও কচি বালিকাটী বই আর কিছুই নহে। মাতা ও পিতামহী বিমলের বিবাহ চিন্তায় অহরহঃ উৎকণ্ঠিতা ছিলেন, কিন্তু সে তাহার কিছুই বুঝিত না। পুতুল খেলা, পুতুলের বিবাহ দেওয়া, এবং তাহাদের সংসার পাতান, এই সব বিষয়ে বিমলের অদ্যাপিও গাঢ় আসক্তি। ধীরেন ও খগেন, এই বাল্যক্রীড়ায় তাহার প্রধান সহযোগী। বলিতে লজ্জা হয়, বিমলের কাকিমাও সময়ে সময়ে সেই খেলায় যোগ দিতেন। বিমল 'কাকিমা' বলিতে অজ্ঞান হইত।

গ্রামে বিমলের বিবাহের একটা কথা উঠিয়াছে। রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ষোড়শবর্ষ বয়স্ক পুত্র বিপিন, গত বৎসর

এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তিদিগের লক্ষ্যপথে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। একে কুলীন, তাহাতে সঙ্গতিপন্ন, এবং পাত্রটী সর্ব্বাংশে উপযুক্তও; সুতরাং অল্প-কাল মধ্যেই বিপিনের বিবাহের অনেকগুলি সম্বন্ধ জুটিয়া গেল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের ইচ্ছা, এল-এ পাস হইলে পুত্রের বিবাহ দিবেন; তবে তৎপূর্ব্বে একটী পাত্রী মনোনীত করিয়া রাখিতে তাঁহার কোন আপত্তি ছিলনা। ভবেশের মাতাও বিমলের জন্য প্রস্তাব করিয়া বসিলেন। বিমল গ্রামের মেয়ে ও পরমা সুন্দরী, এবং তাহার বর্ষীয়সী পিতামহীর অনুরোধ সহজে প্রত্যাখ্যাত হইবার নহে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বিমলের সহিত পুত্রের বিবাহ দিবেন, একরূপ স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু গণপণের টাকাটা কিছু চড়াইয়া ধরিলেন। টাকা কমাইবার জন্য অনুরোধ উপরোধ চলিতে লাগিল। পাঠক! ভবেশের মাতার পত্রে এসকল কথা পূর্ব্বেই জ্ঞাত হইয়াছেন। হরিচরণ এইবার বাড়ী আসিয়া মনোরমার মুখে শুনিলেন।

হরিচরণ শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন, দেখিলেন, ধীরেন ও খগেন দালানে বসিয়া খেলা করিতেছে। বালক খগেন দুইহস্তে বিমলের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, আগ্রহের সহিত বার বার বলিতেছিল, "দিদি, আমা' পুতু' দে।" বিমল তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া, হাতে একটী পুতুল দিল। খগেন পুতুল পাইয়া আহ্লাদে যেন আট-খানা হইল। হরি-চরণ দেখিয়া হাসিলেন; বিমলাকে বলিলেন—"কি মা, খেলা হচ্চে? তোর শরীর ভাল আছে ত? তোর মা ভাল

আছেন ?” তৎপরে ধীরেনকে ক্রোড়ে লইলেন। বিমল সস্মিত বদনে মস্তক সঞ্চালন করিয়া জানাইল, তাহারা ভাল আছে। পরে জিজ্ঞাসা করিল—“হ্যাঁ কাকা! তুমি এলে, বাবা বাড়ী এলেন না কেন ?” হরিচরণ বালিকার এই সরল প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন ? একটু ইতস্ততঃ করিয়া বিমলকে বুঝাইলেন যে, তাহার পিতা কোন কারণে এবার বাড়ী আসিতে পারে নাই, আগামী বারে নিশ্চয়ই আসিবে। বালিকা তাহাই বুঝিল এবং খেলিতে লাগিল। হরিচরণ ধীরেনকে ক্রোড় হইতে নামাইয়া বহির্ব্বাটী গেলেন। খগেন দিদির ক্রোড়ে বসিয়া বাপের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, “আমা’ বাবা।” হরিচরণ তাহা শুনিতে পাইয়া, হতভাগ্য ভবেশের কথা ভাবিয়া একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন।

প্রভাতে স্নানের বেশে মনোরমা বিজয়ার কাছে উপস্থিত হইলেন। বিজয়া শয়নকক্ষে দীনভাবে বসিয়াছিলেন। বিমলা ও ধীরেন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া খেলা করিতে গিয়াছে, সুতরাং তিনি নির্জ্জনে বসিয়া দুঃখ-চিন্তায় আত্মহারা হইয়া-ছিলেন। মনোরমা তাঁহার আকৃতি দেখিয়া ব্যগ্রভাবে বলিলেন—“একি দিদি! তুমি বুঝি সারারাত এইভাবে কাটিয়েচ ? এমন কল্লে ক’দিন বাঁচবে ?”

বিজয়া (বিষাদমাথা হাস্যে)—‘যে ক’দিন কপালে দুঃখ-ভোগ আছে।’

মনোরমা বড় বেদনা পাইয়া বলিলেন—“ছি দিদি, ওসব অলক্ষণের কথা মুখে এন না। শু’নলে আমার বড় কষ্ট হয়।”

বিজয়া এবার হাসিতে হাসিতে মনোরমার হস্ত গ্রহণ করিয়া বলিলেন—"ভয় কি বোন, এখনও অনেকদিন বাঁচব। যা'হ'ক, এত সকালে কেন এলি? ঠাকুরপোর সঙ্গে ঝগড়া করিচিস্ বুঝি?" বিজয়ার হাসি ও শেষ কথাগুলি মনোরমাকে কিয়ৎপরিমাণে আশ্বস্ত করিল। দিদির দুঃখ-ভারাবনত মুখ দেখিলে, তিনি যেরূপ মর্ম্মপীড়িতা হইতেন, তাঁহার হাসি মুখ দেখিলে, মনোরমার প্রাণে সেই পরিমাণে আনন্দ উথলিয়া উঠিত।

বিজয়া—"ঠাকুরপো তোর ভাসুরের কথা কি বল্লেন ভাই? তিনি ভাল আছেন ত?"

মনোরমা—"হ্যাঁ দিদি, ভাল আছেন বৈকি।"

বিজয়া—"তবে এলেন না কেন? সে কথা কি হয়েচে?" প্রশ্নটী আশঙ্কা ও উদ্বেগ-জড়িত।

মনোরমা নিরুত্তর রহিলেন।

বিজয়া—"সত্য বলচিস্ ত তিনি ভাল আছেন?"

মনোরমা—"দিদির ঐ এক ধরণ। কবে ভাই তোমাকে মিছে কথা বলিচি!"

বিজয়া (ঈষৎ হাসিয়া)—"অন্ততঃ একবারও ত বলিচিস্।"

মনোরমা কৌতূহল-পরবশ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"সে কবে দিদি?"

বিজয়া—"গত বৈশাখ মাসে পাহাড়ে যা'বার আগে ঠাকুরপো যখন বাড়ী আসেন, তখন একদিন সকালে তোর মুখখানি ভারি ভারি দেখে, আমি কারণ জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম। মনে পড়ে?"

মনোরমা (সলজ্জভাবে)—"হ্যাঁ দিদি।"

বিজয়া—"বার বার জিজ্ঞাসা করায় তুই বল্লি যে, ঠাকুরপো তোর ওপর রাগ করেচেন। কেমন?"

মনোরমা (অবনতবদনে)—"হাঁ।"

বিজয়া—"কথাটী ত বোন সত্যি নয়।"

মনোরমা (ঈষৎ হাসিয়া)—"কিসে জা'নলে দিদি, সত্য নয়? আমাদের কি মনের অমিল হ'তে নেই।"

বিজয়া একটু দর্প এবং একটু সন্তোষ-সূচক হাস্যের সহিত বলিলেন—"না বোন, তোদের মধ্যে কখনও মনের অমিল হয়নি, এবং প্রার্থনা করি যেন কখনও না হয়। যেখানে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে ভালবেসে প্রাণের বিনিময় করেচে, সেখানে ঝগড়া দ্বন্দ্ব আ'সতেই পারে না। তবে (হাসিয়া) প্রণয়েরও একরকম ঝগড়া আছে স্বীকার করি, তা ভালবাসাতেই উৎপন্ন হয়, এবং সে ঝগড়ার অবসানে ভালবাসা গাঢ়তর হয়। রাগ করিস্‌নে ভাই, আশীর্ব্বাদ করি, তোদের মধ্যে এ ঝগড়ার যেন কখন নিবৃত্তি না হয়।"

মনোরমা—"দিদি, তোমাকে কি আমি আঁট্‌তে পারি। এখন আসল কথাটা কি বল? সত্যি, আমি কিছু বু'ঝতে পাচ্চিনা।"

বিজয়া (হাসিতে হাসিতে)—"আবার মিছা কথা! সেবার ঠাকুরপো পাহাড়ে যা'বেন, তাই কিছুদিন দেখা হ'বে না ব'লে তুই কেঁদিছিলি; লজ্জায় সে কথা আমাকে বলিস্‌নি। কেমন? না ব'লবার যো নাই, প্রমাণ দেব!"

মনোরমা বুঝিলেন, হরিচরণ পাহাড়ে গিয়া তাঁহাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, বিজয়া তাহা পড়িয়াছেন, এবং সম্ভবতঃ

সে পত্র বিজয়ার হস্তগত হইয়াছে, তা'ই লজ্জাবনত-মুখী হইলেন। দিদি তাঁহাকে সময়ে সময়ে ঠাট্টা করিতে ছাড়িতেন না, কিন্তু তিনি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় বিজয়াকে মান্য করিয়া চলিতেন।

বিজয়ার চখে ও মুখে প্রসন্নতার হাসি খেলিতে লাগিল। 'তিনি ভাল থা'কলেই ভাল' এইমাত্র বলিয়া তৈল মাখিতে বসিলেন। মনোরমার কেশদামে তৈলের অল্পতা দেখিয়া, পরমযত্নে তাহা তৈলাভিষিক্ত করিলেন। অতঃপর দুইজনে স্নানে বহির্গত হইলেন।

সূর্য্যোদয়ের পর ভবেশের মাতা হরিচরণের বাড়ী আসিলেন। 'ভবেশ কেন আসিল না, তা'র শরীর ভাল আছে? কোন অসুখ হয় নাই ত?' মাতৃস্বভাব-সুলভ আশঙ্কার বশবর্ত্তী হইয়া, ব্যগ্রভাবে তনয়ের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। আহা! ভবেশের চরিত্র যে কলুষিত হইয়াছে, সে কথা তাঁহার অবিদিত ছিল না। কিন্তু পুত্র কদাপি মাতার বিদ্বেষের পাত্র নহে। হরিচরণ বড় সমস্যায় পড়িলেন,—খুড়ীমাকে কি বলিয়া বুঝাইবেন? বলিলেন, "সে শারীরিক ভালই আছে; বাড়ী আসার কথা তা'কে অনেক ক'রে বুঝিয়ে ব'ললাম, কিন্তু——" তাঁহার আর বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না। বৃদ্ধা সব বুঝিলেন। কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"খরচ পত্র কিছু পাঠিয়েচে কি? সংসার যে আর চলে না!" হরিচরণ বিষণ্নবদনে উত্তর দিলেন—"না।" ভবেশের মাতা একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"এখন কি করি বল বাবা; অন্নাভাবে কি শুকিয়ে ম'রব? বিমল

বড় হ'য়ে উঠ'ল, তা'রই বা উপায় কি! জীবন ও জাতি-ধর্ম্ম কিরূপে রক্ষা হয় বল। ভগবান্, আমার ভবেশের সুমতি দাও!" দুই ফোঁটা অশ্রু বৃদ্ধার গণ্ড বহিয়া ভূমিতে পড়িল। তিনি পুনরায় বলিলেন—"বাবা হরি, তোমার মত সুবোধ ছেলের কাছে আমার ভবেশকে রেখিচি, যা'তে সে ভাল হয় তা করো।" হরিচরণের করুণা-মাখা হৃদয় দুঃখাকুলিত হইল। তিনি আবেগ দমন করিয়া মধুর বচনে বলিলেন—"খুড়ীমা, ভবেশ আমার কাছে আটটী টাকা পাবে, সে টাকা কয়টী আপনাকে দিই, আপনি এখন খরচ করুন। পরে ক'লকাতায় গিয়েই ভবেশের কাছ থেকে সংসার খরচের টাকা পাঠিয়ে দেব।" বলিয়া বৃদ্ধার হাতে আটটী টাকা দিলেন। হরিচরণ মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন,—ভবেশের টাকা পাওয়ার কথা অমূলক। পাঠক! হরিচরণের পাপ পুণ্য বিচার করুন।

নবম পরিচ্ছেদ।

হরিচরণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছেন। প্রণয়িনীর অনুরোধ, বিজয়ার সেই মর্ম্মস্পর্শী দীর্ঘশ্বাস, এবং ভবেশের মাতার বিষাদমাখা মুখ তাঁহার স্মৃতিপটে অঙ্কিত ছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন, যেরূপেই হউক, ভবেশকে রক্ষা করিবেন।

একদা হরিচরণ ভবেশকে নির্জ্জনে তাহার পাপাচারের ফলাফলের কথা বিশদরূপে বুঝাইলেন। কিন্তু দুর্বৃত্ত কিছুতেই

বুঝিল না। তাহার হৃদয় পিশাচের ন্যায় নির্ম্মম। হরিচরণ অবশেষে কৌশলে কুড়িটী টাকা ভবেশের নিকট হইতে লইয়া বলিলেন,—"এই টাকা তোমার বাড়ী পাঠাব; তারা যে অনাহারে মারা যায়!" সাধুর কাছে পাপী স্বভাবতই সঙ্কুচিত হয়। ভবেশ হরিচরণকে একটু ভয় করিত। সে বলিল, "আচ্ছা বাপু, পাঠাও তাতে আপত্তি নাই, কিন্তু এতগুলো টাকা কেন? আট দশটা হ'লেইত যথেষ্ট। মনে করেছিলাম, বিরাজকে এবার একটা present ক'রব, তা বাবা বাদ সা'ধতে লেগেচ!" হরিচরণ বর্ব্বরটাকে কেবল ভৎ'সনা করিলেন মাত্র, টাকাগুলি সেই দিনই বাড়ী পাঠাইয়া দিলেন।

পরদিন শনিবার। হরিচরণ ভবেশকে বলিলেন, "ভবেশ, আগামী সপ্তাহে মহরমের দুইদিন বন্ধ আছে। এবার তোমাকে আমার সঙ্গে বাড়ী যেতেই হবে, কোনরকম ওজর শু'নব না। সংসারের অনেক কাজ রয়েচে, যা' তুমি না গেলে হ'বে না। বিমলের বিবাহের একটা বন্দোবস্ত কত্তেই হ'বে। তুমি অবশ্য জান, আমাদের রাম মুখুয্যের ছেলে বিপিনের সঙ্গে বিমলের বিবাহ সম্বন্ধ উত্থাপন করা হ'য়েচে। রাম মুখুয্যে অতি সৎলোক, এবং গ্রামে ওঁদের মত এক ঘর কুটুম্ব পাওয়া বড় বাঞ্ছনীয়। খুড়ীমা ও তোমার স্ত্রীর একান্ত ইচ্ছা যে, বিপিনের সহিত বিমলের বিবাহ হয়। এবার বাড়ী গিয়ে ওই সম্বন্ধটা যেরূপে হয় ঠিক কত্তে হ'বে। কিছু বেশী টাকা চেয়েচে বলে ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। সময় পড়েচে কঠিন। একবার কোন উপায়ে দায় উদ্ধার হ'লে, আজীবন মেয়ের ভার নিতে হ'বে না।"

বাড়ী যাওয়ার কথায় ভবেশ যত বিরক্ত না হইত, বিমলের বিবাহ প্রস্তাবে তদপেক্ষা শতগুণে বিরক্ত এবং ত্রস্ত হইত। কন্যার বিবাহের কথা সে আদৌ ভাবিত না। প্রত্যুত প্রস্তাবটা কোন পক্ষ হইতে উত্থাপিত হইলে, প্রস্তাব-কারী ভবেশের চক্ষুশূল হইত। ইদানীং তাহা এত ঘন ঘন ভবেশের চিত্তপ্রসাদে আঘাত করিতেছিল যে, পরিবার-দিগকেই যত অনর্থের মূল বিবেচনা করিয়া, দুর্বৃত্ত তাহাদের প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ হইয়াছিল।

হরিচরণের কথায় বিরক্ত হইয়া ভবেশ বলিল,—"যে টুকু বাকি ছিল, এবার তা'ও বুঝি হয়। ধার ক'রে মেয়ের বিয়ে দিই, ঘর বাড়ী জমী জমা বিক্রী হয়ে যাক্,—তা'র পর পথের ভিখারী! ভাল, তা'তেও রাজি আছি, ওঁরা বিষয় বিক্রী ক'রে মেয়ের বিয়ে দিন না, আপত্তি নাই। আমার ওপর কোন দাবী দাওয়া না ক'রলেই হ'ল।"

হরিচরণ ক্রোধে ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন,—"ও কথাটা কি রকম হ'ল ভবেশ?"

ভবেশ (ঈষৎ হাসিয়া)—"না, এই বলছিলাম কি, একান্তই যদি সর্ব্বস্বান্ত হয়ে বিমলের বে দেওয়ার জিদ হ'য়ে থাকে, তবে যেন জমি জমা ও বাড়ীখানি বন্ধক রেখে টাকা ধার করেন। আমার এই সামান্য অবস্থা, ওসব হাঙ্গামে আমাকে যেন না জড়ান হয়।"

হরিচরণ—"অর্থাৎ তোমার মেয়ের বিবাহ দিয়ে, তোমার মাতা, স্ত্রী প্রভৃতি পথের কাঙ্গালী হন, আর তুমি এখানে চাকরীর টাকা মদ ও বেশ্যায় খরচ কর! দেখ ভবেশ,

তুমি ত্যাগ ক'রলেও যতদিন কৃত্তিবাস ও আমি আছি, বিমলের একটা উপায় নিশ্চয় ক'রব; বিপিনের সঙ্গে বিয়ে দিতে না পারি, অন্য পাত্রের সন্ধান ক'রব। কিন্তু তুমি মনেও ভেব না যে, পরিবারদের ঝেড়ে ফেলে, তুমি সুখে পাপজীবন উপভোগ কত্তে পা'রবে। আমাদের যতদূর সাধ্য, তোমার প্রতি শত্রুতাচরণ ক'রব!"

ভবেশ—"আমার কথাটা আগে বুঝেই দেখ। আমি বলচি কি, অত টাকা খরচ ক'রে মেয়ের বিয়ে দেওয়া আমার সাধ্য নয়। পাঁচ শ' টাকা আমি কোথায় পাব?"

হরিচরণ—"বিমল তার মায়ের দুই তিনখানা গহনা পাবে। জমি কিছু বিক্রী কর। আর যে টাকার অকুলান হয়, তা আমি বিনা-সুদে ধার করে দেব। কৃত্তিবাসও সাধ্যমত সাহায্য ক'রবেন। ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিলে কি, টাকার জন্য বাধে?"

ভবেশ পরাভূত হইয়া বিকৃত বদনে বসিয়া রহিল।

হরিচরণ—"আচ্ছা, বিমলার বিবাহ ও তা'র টাকার কথা বাড়ী গিয়ে স্থির ক'রলেই চ'লবে। এখন এ ছুটীতে বাড়ী যাওয়া নিশ্চয় ত?"

ভবেশ বলিল—"সে পরের কথা।"

সেইদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে ভবেশ যথাবিধি সুরাদেবীর উপাসনা করিল। ভক্তের বদনমণ্ডলে উল্লাসের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতে লাগিল।

দশম পরিচ্ছেদ।

রাত্রি আটটা বাজিলে সাজ সজ্জা করিয়া ভবেশ বাহির হইল। তাহার বস্ত্রে সুরভি গন্ধ, বদনে সুরার দুর্গন্ধ, নয়নে গোলাপী নেশার আমেজ, মনে অদম্য উৎসাহ। আপনার ভাবে আপনি বিভোর হইয়া, লম্পট গন্তব্য স্থানের উদ্দেশে চলিয়াছে। হাতে ছড়ি, মাথায় টেড়ী, মুখে শীস, কখন বা গুন্ গুন্ তান, আর হেলিতে দুলিতে গমন। এরূপ সময়ে কলিকাতার রাস্তায় এরূপ আকৃতির অভাব নাই, সুতরাং ভবেশ কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিল না।

ভবেশ সহরের উত্তরাংশে যাইতেছেন। সদর রাস্তা ছাড়িয়া একটী নাতিসঙ্কীর্ণ, নাতিপ্রশস্ত গলিতে উপস্থিত হইল। এই গলির মাঝামাঝি উত্তর দক্ষিণ লম্বা আর একটী গলি। এই শেষোক্ত গলিই ভবেশের গন্তব্যস্থান। গলির দুইধারে একতল ও দ্বিতল গৃহ। সকল গৃহেই আলো জলিতেছে। কোন কোন গৃহে স্ত্রীকণ্ঠ-বিনিঃসৃত তালমান-যুক্ত সঙ্গীত উছলিয়া উঠিতেছে। কোথাও সঙ্গীত-সহকৃত নৃত্য, এবং তৎসহ লম্পটদিগের অশ্লীল উচ্চরব মিশ্রিত হইয়া নরকের ভ্রম ঘটাইতেছে। স্থানে স্থানে গৃহের বারান্দায় বারাঙ্গনাগণ সৌন্দর্য্য-বিযুক্ত দেহে অলঙ্কার ও বেশ-পারিপাট্য দ্বারা সৌন্দর্য্যের ভাণ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও বা রাস্তার উভয়পার্শ্বে স্ব স্ব কুটীরের সন্নিকটে দাঁড়াইয়া,

হতভাগিনীরা পথগামী লোকদিগকে জঘন্য কামনা জানাইতেছে, এবং প্রত্যাখ্যাত হইলে, অশ্লীল সঙ্গীত ধরিয়া মনোভাব প্রশমিত করিতেছে।

এই নারকীদৃশ্যের মধ্য দিয়া ভবেশ যাইতেছিল। সে একস্থানে কোন হতভাগিনীকে অশ্লীল বিদ্রূপ করিয়া, সমুচিত প্রত্যুত্তর পাইল, এবং হাসিতে হাসিতে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া, অপর এক বারাঙ্গনার চিবুকে হাত দিয়া রসিকতা করিল। সেও বিরক্ত হইয়া সবলে ভবেশের হস্ত সরাইয়া দিল, এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার দগ্ধবদন ও মৃত্যু-কামনা করিল। এইরূপে স্থানে স্থানে বারাঙ্গনাদিগের মন্যু সংগ্রহ করিতে করিতে, ভবেশ গলির মোড়ে উপস্থিত হইল। তথায় এক পানওয়ালার দোকান হইতে পান এবং এক মালাকরের দোকান হইতে দুইছড়া ফুলের মালা ক্রয় করিয়া, সম্মুখবর্ত্তী একটী দ্বিতলগৃহে প্রবেশ করিল।

ভবেশ গৃহে প্রবেশ করার অব্যবহিত পরেই, এক ব্যক্তি অলক্ষিত ভাবে সেই পানের দোকানের কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুক ভদ্রবেশধারী। তাঁহাকে দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যাইত যে, তিনি ভবেশের অনুসরণ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার কার্য্যকলাপ ক্রোধাকুলিত চিত্তে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। এক্ষণে ভবেশকে পূর্ব্বোক্ত গৃহে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, আগন্তুক দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন। অবশেষে ইতস্ততঃ চাহিয়া দোকানদারকে বলিলেন, "বাপু! আমাকে অল্পক্ষণের জন্য তোমার দোকানে একটু স্থান দিতে পার? এই লও", বলিয়া তাহার হস্তে একটী

সিকি দিলেন। অপরিচিতের এবম্বিধ প্রস্তাবে পানওয়ালা প্রথমে একটু সন্দিহান হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার আকৃতি ও ভদ্রোচিত পরিচ্ছদ দেখিয়া, এবং তৎপ্রদত্ত রজতখণ্ডের চাকচিক্যে আকৃষ্ট হইয়া, প্রস্তাবে সম্মত হইল। আগন্তুক, পানওয়ালার একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন, এবং সেই বারাঙ্গনার গৃহ লক্ষ্য করিয়া রহিলেন।

প্রায় একদণ্ড পরে একটু নির্জ্জন হইলে, আগন্তুক পানওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাপু, এই কিছুক্ষণ পূর্ব্বে একটী বাবু তোমার দোকানে পান কিনে ওই সম্মুখের বাড়ীতে প্রবেশ করেচে; তোমার মনে পড়্‌চে কি?"

পানওয়ালা বলিল—"আজ্ঞে হাঁ, মনে পড়্‌চে বটে, তিনি ঐ বাড়ীতে গেছেন। মহাশয় কি জন্য একথা জিজ্ঞাসা কল্লেন?"

আগন্তুক—"তুমি বোধ হয়, ও লোকটীকে প্রায়ই ওই বাড়ীতে যাতায়াত কত্তে দেখে থা'কবে?"

পানওয়ালা একটু বিস্মিত হইয়া বলিল—"আজ্ঞা না; আমি পূর্ব্বে যে কখন ওঁকে এস্থানে আ'সতে দেখিচি, তা বোধ হয় না। সুতরাং উনি যে ঐ বাড়ীতে নিয়মিত যাতায়াত করেন, তা ব'লতে পাচ্চি না। আপনি ওঁকে চেনেন?"

আগন্তুক দোকানদারের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়া, পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ও স্ত্রীলোকটার নাম কি ব'লতে পার?"

উত্তর—"বিনোদিনী।"

আগন্তুক মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক ভাবিতে লাগিলেন—"ছি, ছি, এ কদর্য্য স্থানে কেন আসিলাম? লম্পটগণের লীলাস্থল,

ঘৃণিত পাপের রঙ্গভূমি, দিবামানে যাহার সীমায় পদার্পণ করিতে ত্রাস ও ঘৃণা হয়, আজ কেন ঘৃণা-লজ্জা বিসর্জ্জন দিয়া, রাত্রিকালে তথায় অবস্থান করিতেছি! কি উদ্দেশ্যে! ভগবান, কেন আমার এ কুমতি হইল? এ জুগুপ্সিত স্থানে এভাবে অপেক্ষা করিয়া কি হইবে? ছি, ছি, কি দুর্ব্বুদ্ধি! এখনই এস্থান হইতে প্রস্থান করি।" অর্দ্ধোত্থিত হইয়া তিনি কি ভাবিয়া উপবেশন করিলেন, এবং মনে মনে বলিলেন—"না, যাওয়া হইল না। কে যেন আমার প্রাণের নিভৃত কোণে বলিতেছে, 'আরও খানিকক্ষণ থাকিয়া যাও।' ভাল, যখন এতদূর আসিয়াছি, তখন দেখি না কেন, কি কুহকে পড়িয়া নিষ্ঠুর ভবেশ মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে;—কি আমোদে মজিয়া তাহার প্রকৃতি রাক্ষসবৎ কঠিন হইয়াছে।"

অনন্তর সেই বারাঙ্গনা-গৃহে সঙ্গীত ধ্বনিত হইল। তবলার তালে নারীকণ্ঠ ঝঙ্কার দিয়া উঠিল। আগন্তুক শুনিলেন :—

বেহাগ—একতালা।

প্রাণ যারে চায়,
হায় সে কোথায়,
খুঁজে খুঁজে মরি আঁধারে।
প্রাণের মতন,
(বুকভরা ধন)
মিল্‌বে যখন,
ক'রব যতন বঁধুয়ারে॥
ওই দুটী তারা আকাশে,
কার পানে চেয়ে হাসে উল্লাসে,

দুঁহু দোঁহা হে'রে আবেশে,
চুমিছে ভাসিছে সুখনীরে॥
ওদের মিটে হে আশা, প্রাণের তৃষা,
প্রাণ পেয়েচে প্রাণেরে—
বল সে বঁধু কোথা সে আমার,
এ প্রাণের জ্বালা তারে জানারে।
একটী কিরণ সে মুখ চুমিয়ে,
বিরহীর পানে ফিরায়ে দেরে॥

ভবেশ বিভোর, মাতোয়ারা হইয়া তবলায় সঙ্গৎ করিতেছিল। সে পুনঃ পুনঃ 'কেয়াবাৎ' 'বলিহারি' প্রভৃতি বাক্যে গায়িকার উৎসাহ বর্দ্ধন করিতে লাগিল।

সঙ্গীত থামিল; কিন্তু উচ্চ-হাস্যলহরী সেই পৈশাচিক সজীবতা রক্ষা করিল। আবার সঙ্গীত আরম্ভ হইল, আবার থামিল, পুনরায় হাস্যরোল উঠিল। সে উন্মত্ততার বিরাম নাই; তাহা অবসাদ-বিহীন এবং বীভৎস।

প্রায় এক ঘটিকা গতে আগন্তুক উঠিয়া, ধীরে ধীরে সেই নরক ত্যাগ করিলেন। যাইবার সময় একবার মাত্র সেই পাপাগারের দিকে চাহিয়া, ঘৃণা-প্রকটিত ভ্রুকুটী করিলেন। মনের উদ্বেগে তাঁহার মস্তিষ্কে সূচীবেধের যন্ত্রণা অনুভূত হইতেছিল। সদর রাস্তায় উপস্থিত হইলে, শীতল বায়ুপ্রবাহ তাঁহার শিরোবেদনার কতক পরিমাণে উপশম করিল। তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, অনুচ্চস্বরে বলিতে বলিতে চলিলেন—"না জানি, পূর্ব্বজন্মে কি মহাপাপ ক'রেছিলাম, তাই ভগবান এ জীবনে কালসর্পের সহিত

আত্মীয়তা সংঘটন ক'রিয়েচেন। এতগুলি লোক ওর বিষে জর্জ্জরিত হচ্চে, কিন্তু কোন উপায় নাই। যতদিন .না জীবনের অবসান হয়, এ জ্বালা, এ তীব্রজ্বালা নীরবে সহিতেই হইবে। স্পষ্টই বুঝিতেছি, এ দুরাচারকে ধর্ম্মপথে আনা একবারে অসাধ্য। ওঃ! ভবেশ রাক্ষস, সয়তানের দাস! তোর নিষ্ঠুরতায় অসহায় অবলাগণ মরিতে চলিল, আমিও উন্মত্তপ্রায় হইলাম।"

একাদশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতঃকালে ভবেশ বাসায় আসিয়া দেখিল, তাহার শ্যালক কৃত্তিবাস বসিয়া আছেন। হরিচরণও সে সময় বাসায় ছিলেন। কৃত্তিবাস বিজয়ার সহোদর, এবং তাঁহার চারি বৎসরের বড়। ইঁহার কথা পাঠক পরে জানিতে পারিবেন; কারণ, আমাদের আখ্যায়িকার ইনি একজন অন্যতম নায়ক।

বিগত রজনীর কদাচারের চিহ্ন, ভবেশের আকৃতিতে সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছিল। তাহার চক্ষু কোটরগত, ও তৎচতুঃপার্শ্ব কালিকাময়, মুখ শুষ্ক, কেশ রুক্ষ এবং গতি অসাব্যস্ত। কৃত্তিবাসকে দেখিয়া ভবেশ প্রথমে যেন একটু অপ্রতিভ হইল; কিন্তু পাপাচারে সে এমন অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, মুহূর্ত্তমধ্যে সামলাইয়া কর্কশ বিদ্রূপ করিয়া বলিল,—"আরে কেও শালা, ময়ূরে চড়ে কতক্ষণ এলে? কি মনে ক'রে?" এক অনির্ব্বচনীয় ঘৃণার ভাব কৃত্তিবাসের

মুখমণ্ডলে আবির্ভূত হইল। হরিচরণ নিকটে ছিলেন, তিনি তাহা লক্ষ্য করিলেন। কৃত্তিবাস ভবেশের সে অসভ্য রসিকতার উত্তর দিলেন না,—তাহার দিকে চাহিলেনও না।

হরিচরণ বুঝিলেন, উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহারই সমস্যাভাঙ্গা কর্ত্তব্য। তিনি তৎপর হইয়া বলিলেন—"ভবেশ, কাল সন্ধ্যার সময় তুমিও যাই বেরুলে, অমনি কৃত্তিবাস বাবু এসে তোমার খোঁজ কল্লেন; বল্লেন, বিমলের বিবাহ সম্বন্ধে তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা ছিল। আমার কাছে শু'নলেন যে, তুমি কিছু পূর্ব্বে বেরিয়েচ; শুনে কৃত্তিবাস বাবু আর ব'সলেন না, আজ পুনরায় আ'সবেন বলে ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে চ'লে গেলেন। আজ বোধ হয় সেই জন্যই এসেচেন। কেমন কৃত্তিবাস বাবু?"

কৃত্তিবাস হরিচরণের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"হাঁ মহাশয়; কাল বিমলের বিবাহ সম্বন্ধে পরামর্শ করাই প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সে প্রস্তাব পরে হবে, এখন তার চাইতেও গুরুতর একটা কথার মীমাংসা হ'ক। আপনি আমাদের পরম বন্ধু, আপনি একবার ওঁকে (অর্থাৎ ভবেশকে) জিজ্ঞাসা করিবেন কি, উনি পরিবারদের প্রতি কেন এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ কচ্চেন? তা'রা ত কোন দোষে ওঁর কাছে দোষী নয়। ধর্ম্মতঃ উনি তা'দের রক্ষক; ভগবানের কৃপায় দু'পয়সা রোজগারও আছে। তবে কেন স্ত্রী, পুত্র, কন্যাকে দৈন্যদশায় ফেলে, চখের জলে ভাসিয়ে এখানে নিশ্চিন্ত রয়েচেন। হরি বাবু, ওঁকে একবার জিজ্ঞাসা করুন, এ ঘোর নিষ্ঠুরতার সীমা আর কতদূরে আছে। নির্দ্দোষেরা অজস্র চখের জল ফেলেচে, ভূরি ভূরি অনশন-যাতনা সহ্য করেচে। আর কেন? এখন

প্রসন্ন হ'ন!" কৃত্তিবাস উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন, ঘৃণাস্বরে বলিলেন—"ছি ছি, মানুষের যে এত অধঃপতন হ'তে পারে, তা জা'নতাম না! উনি শিক্ষিত, এবং চাকরী ওঁর এক-মাত্র জীবনোপায়; কিন্তু বেশ্যার ছলনায় উন্মত্ত হ'য়ে, হিতাহিত জ্ঞান, মায়ামমতা এককালে হারিয়েচেন! নতুবা সুস্থির-চিত্তে ভেবে দে'খলে অবশ্যই বু'ঝতে পা'রতেন যে, উনি কি সর্ব্বনাশ কত্তে বসেচেন!" হরিচরণ অধোমুখ হইলেন।

ভবেশ একটু রুক্ষস্বরে বলিল,—"কি হে কীর্ত্তিচন্দ্র, আমি কি তোমার ভাসুর যে, 'উনি' বলে সম্বোধন কচ্চ! আর বাবা এত কথা কি জন্য? তোমার ভগ্নীকে বিবাহ করিচি ব'লে খুব একচোট নিলে যা'হ'ক! কিন্তু বাবা, তা'কে সত্যই কি খেতে প'রতে দিই না, যে এত গঞ্জনা! আমাদের হ'ল সখের প্রাণ, ফূর্ত্তি পেলে থাকে ভাল। আর কি জান, (অনুচ্চস্বরে) প্রাণ খোলা আমোদটা ত তোমার ভগ্নিকে দিয়ে পাইনা! হাঃ, হাঃ (বিকটহাস্য)। বাবা, প্রাণের কথা খুলে ব'ললাম, মনে কিছু করো না।"

অগ্নি-সংযোগে শুষ্ক তৃণের ন্যায় কৃত্তিবাস জ্বলিয়া উঠিলেন; ক্রোধ-বিস্ফারিত ভ্রূভঙ্গে ভবেশকে যেন দগ্ধ করিয়া বলিলেন— "পাষণ্ড, নারকী, তুমি পশু অপেক্ষাও নীচ, পিশাচ হইতেও নিষ্ঠুর! তুমি পবিত্র সংসারধর্ম্মকে লম্পটের উপহাসের বিষয় করিতে চাও!" কৃত্তিবাস থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। দু'ফোঁটা অশ্রু তাঁহার কপোল বহিয়া পড়িল। ভবেশের ঘৃণিত প্রত্যুত্তরে, হরিচরণ অতীব লজ্জিত ও মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিলেন; এক্ষণে সহানুভূতির দ্বারা কৃত্তিবাসের মানসিক

যন্ত্রণা সম্যক অনুভব করিয়া, তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইলেন, এবং ভবেশকে প্রচুর ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন।

কৃত্তিবাস উঠিলেন। হরিচরণকে একান্তে লইয়া গিয়া বলিলেন—"হরিবাবু, আমি চলিলাম। এ জীবনে ও পাষণ্ডের মুখ আর দেখিব না! কিন্তু দুঃখিনী ভগিনীটী ও তা'র ছেলে মেয়ের দশা কি হবে, তা'ই ভেবে মনোকষ্টে অস্থির হচ্চি। হায়! বাবা কি সর্ব্বনাশই ক'রে গেছেন,—এমন সোণার মেয়েকে পিশাচের হাতে সমর্পণ করেচেন! নরাধম এক মুহূর্ত্তের জন্যও বিজয়ার মনে সুখ দিল না, বিবাহ হওয়া অবধি তা'কে নিরবচ্ছিন্ন চোখের জলে ভাসালে!" কৃত্তিবাস আর কিছু বলিতে পারিলেন না, মনের আবেগে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইল। হরিচরণের মনোকষ্টের পরিসীমা রহিল না; তিনি কি করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে কৃত্তিবাসকে গমনোন্মুখ দেখিয়া বলিলেন—"ভাই, একটু অপেক্ষা করুন; অধীর হইবেন না। আমাদের বিশেষ সহিষ্ণুতা চাই। আমরা মনের স্থৈর্য্য হারাইলে, এ বিপৎ-প্রতীকারের কিছুমাত্র সম্ভাবনা দেখিতেছি না। ভবেশের প্রকৃতি অধুনা পশুবৎ; ওর ব্যবহারে আমরা মান, অপমান, দুঃখ, ঘৃণা কিছুই লইব না। এইরূপে যথাসাধ্য ভবেশের উদ্ধার চেষ্টা করিতে হইবে। ভগবান সদয় হইলে, অবশ্যই আমরা কৃতকার্য্য হইব। আপনি ভবেশের দুর্ব্যবহার ভুলিয়া যাউন; ও এখনি আপনার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে।"

এই বলিয়া হরিচরণ গম্ভীরস্বরে ভবেশকে ডাকিলেন। ভবেশ তাহার বিসদৃশ ব্যবহার বুঝিতে পারিয়াছিল, এবং

তজ্জন্য একটু অপ্রতিভও হইয়াছিল। সে নিকটে আসিলে, হরিচরণ বলিলেন—"ভবেশ, তুমি এইমাত্র কৃত্তিবাস বাবুর সম্মুখে যে সমস্ত অভদ্রোচিত অশ্লীল-কথা বলিয়াছ, তাহাতে কেবল যে কৃত্তিবাস বাবু অপমানিত ও দুঃখিত হইয়াছেন তাহা নহে, আমিও দুঃখিত এবং লজ্জিত হইয়াছি। তুমি যদি কৃত্তিবাস বাবুর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, এবং আমাদের কথা মত চলিতে সম্মত হও, তাহা হইলে সব মিটিবে, নচেৎ আজ অবধি তোমার সহিত আমাদের বন্ধুতা শেষ হইল। তোমার ব্যবহার অত্যন্ত অসভ্য এবং ঘৃণাজনক!" ভবেশ দেখিল, ব্যাপার গুরুতর হইয়াছে; হরিচরণ তাহার প্রতি বিরূপ হইলে, বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা। সে তৎক্ষণাৎ দোষ স্বীকার করিয়া কৃত্তিবাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল, এবং বলিল—"ভাই! আমরা মাতাল মানুষ, আমাদের বুদ্ধি সকল সময় স্থির থাকে না। না বুঝে দুটো কথা ব'লে ফেলিচি, কিছু মনে ক'র না।" আপাততঃ সকল রক্ষা হইল।

তিন জনে ঘরের ভিতর বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ কাহারও মুখে কথা নাই। শেষে হরিচরণ বলিলেন—"ভবেশ, মহরমের ছুটীতে বাড়ী যেতে হবে যেন মনে থাকে! আমি বাড়ীতে বলে এসিচি যে, এবার তুমি নিশ্চয় যাবে। সকলেই তা'তে আশ্বস্ত আছেন, এবং তোমার প্রতীক্ষা ক'র'চেন। দেখ, যেন আমি অপ্রতিভ না হই!" ভবেশের না বলিবার যো নাই। দুইজন চরিত্রবান পুরুষ দুইপার্শ্বে বসিয়া, তাহার প্রতি খরতর বিরাগদৃষ্টি নিহিত রাখিয়াছিলেন। সে দৃষ্টিতে পাপিষ্ঠ আন্তরিক একটু উদ্বিগ্ন হইয়াছিল। ভবেশ বলিল—

"হাঁ, এবার বাড়ী যা'ব বৈকি; শরীর অসুখ বলেই ত পূর্ব্বে যেতে পারিনি।"

শেষোক্ত কথাটী শুনিয়া, হরিচরণ ও কৃত্তিবাস অধিকতর বিরক্ত হইলেন। যাহা হউক, তৎপরে কোনরূপে মনোভাব দমন করিয়া হরিচরণ কৃত্তিবাসকে বলিলেন—"কৃত্তিবাস বাবু, এখন আমাদের প্রধান কাজ বিমলের সম্বন্ধটা পাকা করে ফেলা। আপনার ভগিনীর একান্ত ইচ্ছা যে, বিপিনের সঙ্গে বিমলের বিবাহ দেন। আমাদের ইচ্ছাও তাই। ভগবানের কৃপায় এ বিবাহ যদি হয়, তবে সকল বিষয়ই সুখের হ'বে। এখন টাকাটা কিছু কমান আবশ্যক। আমার বিবেচনায় আপনি আমাদের সঙ্গে গেলে ভাল হয়। সকলে সাধ্যসাধনা ক'রলে, টাকা ক'মতে পারে।"

কৃত্তিবাস—"ভাই, আপনি যখন মধ্যবর্ত্তী রয়েচেন, তখন আমার যাওয়া নিষ্প্রয়োজন। যেরূপ স্থির হয়, আমাকে সংবাদ দিবেন। আমি এখন চলিলাম।" এই বলিয়া তিনি ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

কৃত্তিবাস চলিয়া গেলে হরিচরণ ভবেশকে বলিলেন—"দেখ ভবেশ, বিমল সেবার আমাকে বলেচে 'কাকা, বাবাকে ব'লো এবার তিনি যখন বাড়ী আ'সবেন, আমার জন্যে যেন একখানি ভাল কাপড়, একটা জামা আর পুঁতুল নিয়ে আ'সেন; আর খোকা (ধীরেন) বলেচে, তা'র জন্য রেলগাড়ী নিয়ে যেতে। এই জিনিষগুলি অবশ্য অবশ্য নিয়ে যেতে হ'বে। আমাকে টাকা দাও, আমি সব কিনে আ'নব।" ভবেশের মুখভাব ঈষৎ বিরক্তি-ব্যঞ্জক; হরিচরণ তাহা দেখিলেন,

কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তিনি পুনরায় বলিলেন,—"তবে আমি বাড়ীতে চিটি লিখি যে, বৃহস্পতিবার রাত্রির ট্রেণে আমরা রওনা হইব?" ভবেশ মস্তক সঞ্চালন করিয়া সম্মতি জানাইল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

মধ্য রজনীতে মনোরমা এক অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়া শিহরিয়া জাগ্রত হইলেন। যেন তিনি প্রিয়তমের হস্ত ধরিয়া, এক রমণীয় প্রদেশে বিচরণ করিতেছেন। খগেন হরিচরণের ক্রোড়ে রহিয়াছে। অদূরে তাঁহাদের পুরোভাগে মেঘাকার শৈলশ্রেণী; তাহার পাদদেশে একটী খরস্রোতা ক্ষুদ্র নদী প্রবাহিতা। মনোরমা দেখিলেন, স্তবকে স্তবকে বিকসিত কুসুম তরু-দেহ শোভিত করিয়াছে। সমগ্র পৃথিবী যেন হাস্যমুখী! সুরভি কুসুম-নিচয় ভ্রমর গুঞ্জিত, পত্র-পুষ্প-শোভিত শ্যামল তরু বিহগ-কূজিত। প্রকৃতির সেই সৌন্দর্য্যে মনোরমা মোহিত হইলেন। তিনি উল্লাসে উৎফুল্লা হইয়া, প্রিয়তমের হস্ত ত্যাগ পূর্ব্বক ইতস্ততঃ দ্রুত পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হরিচরণ হাসিয়া প্রিয়াকে প্রতিনিবৃত্ত হইতে বলিলেন, কিন্তু মনোরমা তাহা শুনিলেন না। তিনি কোকিল-কূজিত বৃক্ষতলে গিয়া মহোল্লাসে করতালি দিলেন, পিকবর অমনি 'কু—উ' বলিয়া বৃক্ষান্তরে উড়িয়া গেল। মনোরমা বুঝিলেন, কোকিল বলিল, 'কু—উ' 'ছি', অর্থাৎ

অকারণ কেন আমার সুখভঙ্গ করিলে? অদূরে এক কুরঙ্গ শিশুকে দেখিয়া, মনোরমা ছুটিয়া ধরিতে গেলেন। তিনি যতই অগ্রসর হইতে লাগিলেন, মৃগশাবকও ক্ষিপ্র গতিতে পিছু হঠিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া তাঁহার মুখপানে চাহিতে লাগিল। বুঝি সে তাহার নয়নচোরকে চিনিতে পারিয়াছিল।

মনোরমা এইরূপে প্রিয়তমের দৃষ্টি বহির্ভূত হইলেন, কিন্তু তাঁহার সে জ্ঞান নাই। মৃগশিশু আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া থামিল, এবং প্রীতি-প্রফুল্ল-নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। এবার সে ধরা দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। মনোরমা হাসিতে হাসিতে তাহাকে ধরিয়া নবপত্র ও দুর্ব্বাদল চয়ন পূর্ব্বক পরমযত্নে তাহার কবলে দিতে লাগিলেন। অতঃপর কোথা হইতে দলে দলে মেষ, ছাগ ও অশ্ব শিশু আসিয়া মনোরমাকে ঘিরিয়া ফেলিল, এবং তাঁহার হস্ত হইতে আহার গ্রহণাভিপ্রায়ে আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিতে লাগিল। তিনি দেখিলেন, চতুঃপার্শ্বস্থ বৃক্ষে বিবিধ জাতীয় বিহঙ্গম বসিয়া, তাঁহার দিকে চাহিয়া কাকলী করিতেছে। যেন তাঁহার আদর পাইলে সকলেই চরিতার্থ হয়।

উপস্থিত ক্ষেত্রে কাহার কিরূপ যত্ন করিবেন, তাই ভাবিতে ব্যস্ত হইয়াছেন, এমন সময়ে মনোরমা অকস্মাৎ একটী করুণ আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। তাহা শুনিবামাত্র সমাগত পশু পক্ষীগুলি ভয়চকিত ভাবে কে কোথায় লুকাইল। মনোরমার চক্ষুর উপর মুহূর্ত্ত মধ্যে দৃশ্য পরিবর্ত্তিত হইল! তিনি দেখিলেন, একটী রমণী কাতরভাবে রোদন করিতে করিতে একটী পুরুষের পদপ্রান্তে লুণ্ঠিতা হইতেছে। দেখিতে

দেখিতে পাষাণহৃদয় পুরুষটী ক্রোধে রমণীকে পদাঘাত করিয়া, অসহায়াবস্থায় ফেলিয়া চলিল। এই নিষ্ঠুর ব্যবহারে মর্ম্মাহত হইয়া, মনোরমা রমণীর সাহায্যার্থে ধাবিত হইলেন। রমণীও মুহূর্ত্তমধ্যে উঠিয়া মলিনবদনে কাতরতা-ব্যঞ্জক নেত্রে পুরুষের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। পুরুষটী এত দ্রুত চলিতেছিল যে, রমণী প্রতিমুহূর্ত্তে পাছু হঠিয়া পড়িতে লাগিল। এদিকে প্রকৃতি অন্ধকারাচ্ছন্ন হইল। মনোরমা অন্ধকার ছায়ার মধ্যে একবার মাত্র সেই পুরুষের ক্রোধ-বিকৃত বিকট মুখ দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাহার পর সব অদৃশ্য হইল। মনোরমার বোধ হইল, সেই পুরুষ ও রমণী তাঁহার পরিচিত; কিন্তু তাহারা যে কে কোথায় গেল, কোনমতে স্থির করিতে পারিলেন না।

মনোরমা দ্রুতপদে চলিতে চলিতে নদীতীরে পৌঁছিলেন। অকস্মাৎ গগন-মণ্ডল ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন হইল। সেই ক্ষুদ্র তটিনীর স্বাভাবিক কৃষ্ণজল গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে দিঙ্‌মণ্ডল কম্পিত করিয়া, তুমুল ঝটিকা উত্থিত হইল। উত্তাল বীচিমালা তটিনীর বক্ষ আলোড়িত করিতে লাগিল। মনোরমা সভয়ে দেখিলেন, তরঙ্গিত নদীজলে হাঙ্গর, কুম্ভীর প্রভৃতি ভয়াবহ জীব মুখব্যাদন করিয়া, ইতস্ততঃ ফিরিতেছে। তিনি ভয়-কম্পিত কলেবরে তীরজাত একটী বৃক্ষের শাখা ধরিয়া রহিলেন।

পরক্ষণে মনোরমা দেখিলেন, একখানি ক্ষুদ্র জীর্ণ তরণী প্রবল বায়ুবশে তীরবেগে সেই নদীবক্ষে ছুটিয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে দুইটী নরমূর্ত্তি। তিনি ভাবিলেন, কি সর্ব্বনাশ!

অভাগারা যে মুহূর্ত্তমধ্যে জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইবে। করুণাময়ীর হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল।

অকস্মাৎ তরণীর গতি পরিবর্ত্তিত হইল। মনোরমার নিকট নদীকূলে নৌকাখানি বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। ঝটিকা অধিকতর ভীষণবেগে বহিতে লাগিল, ঝাপটে ঝাপটে জল সেই মজ্জনোন্মুখ তরণীতে প্রবেশ করিতে লাগিল। মনোরমা নিমেষ মধ্যে দেখিলেন, আরোহীদ্বয় রমণী, একটী যুবতী, অপরটী বালিকা। তিনি স্বীয় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনশব্দ শুনিতে পাইতেছিলেন!

তীর হইতে প্রায় দশহস্ত দূরে তরি জলমগ্ন হইল। আরোহিণীদ্বয় হৃদয়-বিদারক চীৎকার করিয়া, মনোরমার দিকে হস্ত প্রসারণ করিল। মনোরমা অভাগিনীদিগকে চিনিলেন— তাহারা বিজয় ও বিমল। দয়াশীলা স্বকীয় বিপদ বিস্মৃত হইলেন; উন্মাদিনীর ন্যায় ছুটিয়া গিয়া নদীকূলে দাঁড়াইলেন। জলে ঝম্প প্রদান করিবার উপক্রম করিতেছেন, এমন সময়ে কে যেন পশ্চাৎ হইতে তাঁহার হস্ত ধরিল। তিনি ফিরিয়া দেখিলেন, হরিচরণ। অমনি হতাশে কাঁদিয়া উঠিলেন।

মনোরমার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহার হৃৎকম্প হইতে ছিল। এমন বিভীষিকাময় স্বপ্ন, তিনি আর কখন দেখেন নাই। একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তিনি ভাবিলেন, "কেন আজ অকস্মাৎ এ দুঃস্বপ্ন দেখিলাম; ইহার কি কোন নিগূঢ় উদ্দেশ্য আছে?" তখনি মনে হইল, ইহা অলীক স্বপ্ন বই আর কিছুই নয়। মনঃস্থির করিয়া মনোরমা দুর্গানাম স্মরণ করিলেন,—তাহার পর পুনরায় সুখনিদ্রায় অভিভূত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

প্রভাতে পক্ষিকুল কলরব করিয়া মনোরমার নিদ্রাভঙ্গ করিল। খোকা কিছু পূর্ব্বে জাগিয়াছিল। সে হাত পা নাড়িয়া আপন মনে বকিতেছিল ও খেলা করিতেছিল, এবং মাঝে মাঝে মাতার অঞ্চল আকর্ষণ পূর্ব্বক স্বীয় ক্ষুদ্র আস্যবিবরে প্রবেশ করাইয়া চর্ব্বণ করিতেছিল। মাতা তৎকালে নিদ্রিতা ছিলেন, সুতরাং শিশুর এবম্বিধ 'মুখরতার' পরিচয় পান নাই।

মনোরমা শয্যাত্যাগ করিয়া উঠিলেন, এবং ননীর পুঁতুলটী ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে তাহার মুখচুম্বন করিলেন। জননীর প্রাণভরা স্নেহ উপভোগ করিয়া শিশু হাসিল,—সেই হাসি জননীর প্রাণে সুধাবর্ষণ করিল। পুনঃ পুনঃ তনয়ের মুখ চুম্বন করিয়া মনোরমা নীচের তলায় আসিলেন।

হরিচরণের মাতা অতি প্রত্যূষে উঠিয়া নদীতে স্নান করিতে গিয়াছিলেন। কি শীত, কি গ্রীষ্ম, সকল ঋতুতেই তিনি নিয়মিত প্রাতঃস্নান করিতেন। সে নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে কেহ কখন দেখে নাই। আমাদের নব্যতন্ত্রের বিলাসিনী রমণীরা হয়ত বলিবেন যে, সেকেলে বৃদ্ধাদের ওটা একরকম রোগ। তাহা হইতে পারে, কিন্তু আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত আছি যে, হরিচরণের মাতা একদিনের তরেও হিষ্টিরিয়া, অথবা শিরঃপীড়া জানেন নাই। নব্যাদের

মধ্যে এই আধুনিক ব্যাধির বাড়াবাড়ি দেখিয়া, বৃদ্ধা আন্তরিক দুঃখ-প্রকাশ করিতেন, আর বলিতেন যে, তাঁহাদের সেকালে এসকল সৃষ্টি ছাড়া রোগ আদৌ ছিলনা। তিনি এত যে প্রাচীনা হইয়াছিলেন, তথাপি সংসারের সমস্ত কাজ একাকিনী নির্ব্বাহ করিতেন। প্রিয়তমা বধূকে অদ্যাপি সামান্য ভারটী দিতে চাহিতেন না। তাঁহাকে খাওয়াইয়া পরাইয়া যত্ন করিয়াই বৃদ্ধার সুখ। পাড়া প্রতিবেশী গৃহস্থ গৃহে সামাজিক ক্রিয়া কর্ম্ম উপস্থিত হইলে, হরিচরণের মাতা সাগ্রহে আমন্ত্রিতা হইতেন। রন্ধন ব্যাপারের ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিয়া গৃহস্থ নিশ্চিন্ত থাকিত। সেই বর্ষীয়সীর এতাদৃশ কার্য্যপরতা ও সামর্থ্যের কথা শুনিয়া, নব্যারা কি বিস্মিত হইবেন না?

পরিচারিকা ইতিপূর্ব্বেই গৃহ ও প্রাঙ্গণ ঝাঁটাইয়া, উঠানে গোবর ছড়া দিয়া, উনান জ্বালিয়াছে। রাখাল গাভী দোহাইয়া মাঠে চরাইতে লইয়া গিয়াছে। মনোরমা খোকার জন্য দুধ জ্বাল দিতে বসিলেন। দুধ জ্বাল হইলে, রান্নাঘরে বসিয়া সোহাগ করিয়া খোকাকে দুধ খাওয়াইতে লাগিলেন। খোকা প্রত্যেক ঢোক গিলিয়া মায়ের মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল, এবং মাঝে মাঝে বলিতে লাগিল,—'মা তুই খা।' মা আকর্ণ-বিশ্রান্ত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া, সেই হাসিতে যোগ দিলেন, এবং এক একবার নিজে পান করিবার ছলে ঝিনুক মুখের কাছে লইয়া গিয়া, খোকার মুখেই ঢালিয়া দিতে লাগিলেন।

হরিচরণের মাতা স্নান করিয়া আসিয়া কাপড় ছাড়িলেন। অনন্তর ইষ্ট-দেবের আরাধনা সমাপন করিয়া, খোকাকে

ক্রোড়ে লইলেন, এবং মুখচুম্বন করিয়া বিবিধ বিধানে সোহাগ করিতে বসিয়া গেলেন। শিশুর নবোদ্ভিন্ন-দশন-শোভা-সমন্বিত বদনে হাস্য-লহরী উছলিয়া উঠিল। বালক ক্ষুদ্র হস্তে পিতামহীর কেশ আকর্ষণ করিয়া পরাক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে ডাক-পিয়ন মনোরমার একখানি পত্র দিয়া গেল। মনোরমা প্রিয়তমের পত্র প্রতীক্ষা করিতেছিলেন,—তিনি সানন্দে পত্রপাঠ করিলেন ঃ—

"প্রিয়তমে—

আজ রাত্রির গাড়ীতে আমি ও ভবেশ বাড়ী যাইব। ষ্টেশনে লোক পাঠাইও। অনেক কষ্টে ভবেশকে বাটী যাওয়ায় সম্মত করিয়াছি, এবং এবার নিশ্চয়ই লইয়া যাইব। কিন্তু এরূপে কত দিন চলিবে? যাহা হউক, তুমি ভবেশের বাড়ী খবর দিও, এবং যাহা যাহা কর্ত্তব্য মনে কর, তোমার বিজয়া দিদিকে সেইরূপ পরামর্শ দিও। আমরা ভাল আছি। ইতি।"

পত্র পাঠ করিয়া মনোরমা শাশুড়ীকে তাহার মর্ম্ম জানাইলেন। হরিচরণ ভবেশকে বাড়ী লইয়া আসিতেছেন শুনিয়া মাতার হর্ষের সীমা রহিল না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

মনোরমা তাড়াতাড়ি তৈল মাখিয়া, গামছা লইয়া, দ্রুত-পদ-বিক্ষেপে বিজয়াকে এ সুসংবাদ দিতে গেলেন। অভাগিনী বিজয়া দিদি আজ কত সুখী হইবেন মনে করিয়া, মনোরমা পুলকে অধীরা হইলেন;—তাঁহার সৌন্দর্য্য যেন উছলিয়া উঠিতে লাগিল।

বিজয়া বিমলের চুল খুলিয়া তৈল মাখাইতেছিলেন। বালক ধীরেন কাছে বসিয়া খেলা করিতেছিল। একটা বিড়াল দীনভাবে ধীরেনের দিকে চাহিয়া, তাহার গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিতেছিল। বালক কৌতুক-পরবশ হইয়া একগাছি যষ্টি দ্বারা, বিড়ালকে তাড়না করিয়া মহোল্লাসে উচ্চরব করিতে লাগিল। কিন্তু মার্জ্জারপ্রবর শিশুর পরাক্রমের দৌড় বুঝিতে পারিয়া, কেবল ইতস্ততঃ সরিয়া বসিতে লাগিল। বিজয়া পদশব্দে ফিরিয়া দেখিলেন, মনোরমা। মনোরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"দিদি, ভাসুর আজ বাড়ী আস্‌বেন, এইমাত্র খবর পেলাম; আজ কি সুখের দিন!"

পাঠক! মাসাধিক পূর্ব্বে বিজয়াকে একবার দেখিয়াছেন; কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যে তাঁহার আকৃতির এতাদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে, দেখিলে মন বিষাদিত হয়। বিজয়ার বয়ঃক্রম এক্ষণে ছাব্বিশ বৎসর, সুতরাং তিনি অদ্যাপি

যৌবনের সীমা অতিক্রম করেন নাই। অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যেরূপ গঠন ও সমাবেশে রমণী-সৌন্দর্য্যের উৎকর্ষ ধারণা করা যায়, তাহার সমুদয়ই বিজয়াতে ছিল। বিজয়ার বর্ণ, উজ্জ্বল গৌর; দেহ, নাতিস্থূল নাতিকৃশ; অঙ্গুলি, সরল ও সুঠাম; নয়ন, বিস্ফারিত এবং প্রশান্তদৃষ্টি; নাসিকা, বংশী-বিনিন্দিত; ওষ্ঠদ্বয়, পুরন্ত ও রক্তাভ, বোধ হইত যেন তুলিকা দ্বারা অঙ্কিত। এক কথায় বিজয়া পরমা সুন্দরী। কিন্তু হায়! এমন সৌন্দর্য্য বয়োবৃদ্ধিতে না হইয়া অনাদরে বিধ্বস্ত হইতেছিল। সে অপ্সরো-বিনিন্দিত মুখ এক্ষণে শুষ্ক ও লাবণ্যহীন, এবং সদাই বিষাদমাখা। যেন এক গভীর দুশ্চিন্তা অহর্নিশ বিজয়ার চিত্ত আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে। তাঁহার মুখে প্রাণভরা হাসি বহুকাল কেহ দেখে নাই। আহা, অভাগিনীর জীবন এক্ষণে মরুপ্রায়, সুখচিন্তা তথায় স্থান পাইত না।

বিজয়া চমকিয়া উঠিলেন। বুঝি তাঁহার শুনিতে ভ্রম হইয়াছে। মনোরমা কাহার বাড়ী আসার সংবাদ দিল! 'ভাসুর আজ বাড়ী আস্‌বেন!' কে, ভবেশ? বিজয়ার জীবিতেশ্বর এতদিনের পর আজ দেখা দিতে আসিবেন? না, না, অসম্ভব! সংবাদটী বিজয়ার নিকট যেন অতীতের স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান হইল। তাঁহার কপালে কি ভগবান্ সুখভোগ লিখিয়াছেন? স্বামীর অনুরাগ কি তিনি এজন্মে ফিরিয়া পাইবেন? বিজয়া ধীরে ধীরে একটী নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন। ভাবিলেন, হয়ত ভগবান্ ভবেশের সুমতি দিয়াছেন; তিনি ইচ্ছাময়, তাঁহার দয়া হইলে ভবেশ কেন, কত মহাপাতকীর উদ্ধার হয়।

বিজয়ার চমক ভাঙ্গিল। তিনি মনোরমার মুখপানে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আয় বোন্ বস; দাঁড়িয়ে রইলি কেন? আমার, ভাই, মনে কত রকম তোলাপাড়া হচ্চে, তা কি বল্‌ব! বুকের ভিতর কেমন ধড়ফড় কচ্চে! তুই একটু বস্, আমি তেল মেখে নিই।" ইত্যবসরে বিমল 'ঠাকুমা, বাবা আজ বাড়ী আস্‌বে' আগ্রহ সহকারে এই কথা বলিয়া দৌড়িয়া রন্ধনশালায় পিতামহীকে খবর দিতে গেল। ধীরেন অবাক্ হইয়া তাহার কাকীমার দিকে চাহিয়াছিল। মনোরমা তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সস্নেহে মুখচুম্বন করিলেন, এবং বলিলেন—"খোকা, আজ তোর বাবা বাড়ী আস্‌বেন শুনিচিস্? তোর জন্যে কত খেলার জিনিষ নিয়ে আস্‌বেন।" বালক হর্ষোৎফুল্ল মুখে তাড়াতাড়ি খুড়ীমার কোল হইতে নামিয়া, 'বাবা আস্‌বে' বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে ঠাকুরমার কাছে গেল।

পাঠক! দেখিলেন, বালক ধীরেন 'বাবা' আসিবে শুনিয়া কত আহ্লাদিত হইয়াছে? প্রকৃত প্রস্তাবে জ্ঞান হওয়া অবধি ধীরেন তাহার 'বাবাকে' খুব অল্পই দেখিয়াছিল; সুতরাং অন্যান্য বালকের ন্যায় 'বাবার' ক্রোড়ে উঠিয়া আদর উপভোগ করা, তাহার ভাগ্যে খুব কম ঘটিয়াছে। সে কেবলমাত্র জানিত যে, তাহার 'বাবা' আছে, এবং এই পর্য্যন্ত বুঝিত যে, 'বাবার' কাছে আবদার করিতে হয়, তাহা হইলে খেলার জিনিষ পাওয়া যায়। উপস্থিতক্ষেত্রে তাহার ইহার অধিক জানার ক্ষমতা অথবা প্রয়োজন ছিল না। নিষ্ঠুর ভবেশ! একবার চাহিয়াও দেখিলে না যে, তোমার

স্নেহ-শিশির ব্যতিরেকে তোমারই উদ্যানের এ অর্দ্ধস্ফুট গোলাপ-কলিকাটী ফুটিতে পারিতেছে না!

বিজয়া বহু চেষ্টা করিয়াও অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তাঁহার চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। অঞ্চল দ্বারা চক্ষু মুছিয়া মনোরমাকে বলিলেন—"ভাই, তিনি এতদিন পরে যে দয়া ক'রে আস্‌চেন, এ আমাদের পরম সৌভাগ্য। কিন্তু ভাই, তিনি কি আজ আপনা হ'তে আস্‌চেন? এ হতভাগ্যদের কি স্নেহের চক্ষে দেখ্‌তে আস্‌চেন? এতদিন যাদের একবারে ভুলে ছিলেন, আজ কি হঠাৎ তাদের মনে পড়েচে,—আবার কি তা'দের ওপর মায়া দয়া ফিরে এসেচে? আমার বোধ হচ্চে যে, ঠাকুরপোর অনুরোধ উপরোধে তিনি একবার দেখা দিতে আস্‌চেন মাত্র।" মনোরমা আসল কথা জানেন, কিন্তু প্রকাশ্যে বলিলেন—"দিদি, বৃথা আশঙ্কা ক'রো না; আপনার জনকে ভুলে মানুষ ক'দিন থাকৃতে পারে? ভাসুর এতদিন হয়ত মোহবশতঃ তোমাদের তাচ্ছল্য করেচেন, এখন চৈতন্য হয়েচে। এস, আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করি। চল, নেয়ে আসি।"

বিজয়া বিমলাকে ডাকিলেন। 'এই যাই মা' বলিয়া বালিকা হাসিমুখে ছুটিয়া আসিল। বিমলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বৃদ্ধা ঠাকুরমাও আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার বদনে প্রশান্ত হাসি খেলিতেছিল। আজ ভবেশের গৃহে অননুভূত পূর্ব্ব আনন্দের উৎস খুলিয়াছে। কেন? ভবেশ গৃহে আসিবে বলিয়া! অহো নিষ্ঠুর!! ভবেশের মাতা মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ বউমা, হরি লিখেচেন ভবেশ আজ আস্‌বে?"

মনোরমা অবগুণ্ঠন ঈষৎ টানিয়া উত্তর দিলেন "হাঁ খুড়ীমা; আজ. রাত্রের গাড়িতে আস্‌বেন। আমাদের লোক ষ্টেশনে থাক্‌বে।" বৃদ্ধা বলিলেন—"যাও মা, তোমরা সকাল সকাল নেয়ে এসগে; বিমলকেও সঙ্গে নিয়ে যাও।" বিমল সানন্দে তাহার মা ও কাকীমার দলপুষ্ট করিল। তিনজনে স্নান করিতে গেলেন।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

সেইদিন সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে মনোরমা বিজয়াকে ডাকিয়া লইয়া, রায়েদের পুকুরে গা ধুইতে গেলেন।

পুষ্করিণীর পাড়ে শ্রেণীবদ্ধ নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষ; তাহাদের সুচিক্কণ পত্রে অস্ত-গমনোন্মুখ সূর্য্যের কিরণ চিক্ চিক্ করিতেছিল। মৃদুমন্দ সমীরণে সরসীজলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিল্লোল নাচিতেছিল। বালিকাবৃন্দ যুগপৎ চপলতা ও মুখরতার চূড়ান্ত পরিচয় দিতেছিল,—কাহার সাধ্য তাহাদিগকে নিবৃত্ত করে। কেহ অর্দ্ধ-নিমজ্জিত, কেহ বা আগ্রীব-নিমজ্জিত হইয়া মহোল্লাসে জলক্রীড়ায় রত, কেহ কেহ কলসীর উপর ভর দিয়া ইতস্ততঃ সন্তরণ করিতেছে। বস্তুতঃ বালিকাদের কলরবে ঘাট শব্দায়মান। বর্ষীয়সীরা সে কোলাহলে বিরক্ত হইয়া, মাঝে মাঝে তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেছিলেন।

কিশোরীরাও বালিকাদের উপর অতিশয় নারাজ। তাহাদের এবম্বিধ ক্রীড়াপরতার অসারতা অনুভব করিয়া,

যুবতীবৃন্দ মনে মনে বিরক্ত ও আশ্চর্য্য হইতেছিলেন। কিন্তু ভাবিনীরা একটু স্থিরচিত্তে প্রণিধান করিলে বুঝিতে পারিতেন যে, তাঁহারাও এক সময়ে এই অসার উন্মত্ততাকে সারজ্ঞান করিয়া, অপরিসীম আনন্দভোগ করিয়াছিলেন। সে বড় অধিকদিনের কথা নয়; কিন্তু কি এক ইন্দ্রজাল প্রভাবে সে ভাব যেন অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। তাঁহাদের নবীন-জীবনে অনন্ত প্রেমের জোয়ার বহিতেছে,—সংসারকে তাঁহারা এক্ষণে বিভিন্নচক্ষে দেখিতেছেন। সমবেত কিশোরী-গণ গাত্র-মার্জ্জনায় ভূরি পরিমাণ আয়াস স্বীকার করিতে-ছিলেন। কেহ বা সুগন্ধি সাবানের সাহায্যে সুন্দর মুখের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিতেছিলেন। যাঁহার সাবান ছিল না, তিনি বিবিধ বিধানে গামছার সাহায্য লইতেছিলেন। ফলতঃ তাঁহাদের কল্পনা 'স্বপনে জাগরণে' মন্দার-শোভিত নন্দন-কাননে বিচরণ করিতেছিল, মলয়ানিল-সংস্পর্শে শিহরিতেছিল, পিক কুহরণে চমকিয়া উঠিতেছিল।

প্রবীণারা বালিকাদের হাসিখুসি ভাল বাসেন না, যুবতীদের প্রেমের কাহিনী বাতুলের প্রলাপ মনে করেন। তাঁহারা পরস্পরের মধ্যে সাংসারিক কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। এমন সময় মনোরমা, বিজয়া ও বিমলা ঘাটে উপস্থিত হইলেন।

বিমলাকে বালিকারা দলে টানিয়া লইল। চারু বলিল, "ওলো তোরা শুনিচিস, বিমল নাকি বিপিনদাদার বৌ হবে? তা ভাই বৌ হ'লে ত আর বিমল এমন করে মুখের কাপড় খুলে সাঁতার কাট্‌তে পা'রবে না।" বালিকারা হাসিয়া উঠিল; শান্ত বিমল অপ্রতিভ হইল।

নবীনের মা বিজয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ গা, শুন্‌চি নাকি আমাদের বিপিনের সঙ্গে তোমার বিমলের বে' হ'বার কথা হয়েচে? আহা তা হোক্; যেমন ছেলে তেমনি মেয়ে।" মনোরমা উত্তর দিলেন—"বে'র কথা হয়েচে বটে, এখন আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন শুভকাজটা সুসম্পন্ন হয়। আমরা গরিব মানুষ, ইচ্ছা থা'কলেও উপযুক্ত দান পণ দোবার সাধ্য নাই। তা যেমনি হ'ক, ওঁরা দয়া ক'রে আমাদের মেয়েটীকে নিন।" নবীনের মা বলিলেন—"সত্যিই ত; সুধু টাকা দে'খলেই হয় না, মেয়েটী আগে দে'খতে হয়। তা এ বিয়ে হ'লে বিমল যে আমার নাত্‌বৌ হ'বে।" মনোরমা ও বিজয়া সন্তোষসূচক ঈষৎ হাস্য করিলেন। গা ধোয়া হইলে তিনজনে গৃহে ফিরিলেন। বিমল তাহার ক্ষুদ্র ঘড়াটী জলপূর্ণ করিয়া কক্ষে লইয়াছিল।

হরিচরণের মাতা রন্ধনকার্য্যে ব্যাপৃতা। মনোরমা খগেনকে দুধ খাওয়াইয়া, জামা পরাইয়া, চাকরাণীর কোলে দিলেন; তাড়াতাড়ি পান সাজিয়া বিছানা করিলেন; তাহার পর ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বিজয়া দিদিকে দেখিতে গেলেন।

বিজয়া সংসারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। হাসিতে হাসিতে মনোরমা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বিজয়া ভগিনীকে সাদর সম্ভাষণ করিবার পূর্ব্বেই মনোরমা বলিলেন, "দিদি তুমি বিছানা করগে; আমি আগে বিমলের চুল বেঁধে দিই, তারপর পান সাজব।" মনোরমা বিমলকে ডাকিয়া বলিলেন, "আয় মা বিমল, তোর চুল বেঁধে দিই। বাপ এসে যেন ব'লতে না পারেন যে, মেয়েটার অযত্ন হ'য়েছে।" বিমল

হাসিতে হাসিতে চুলের গুছি ও চিরুণী লইয়া কাকীমার কাছে উপস্থিত হইল; মনোরমা তাহার চুল বাঁধিতে বসিলেন।

বিজয়া বিছানা করিতে গেলেন; মনে মনে ভাবিলেন, 'হায়! বিমলের অযত্নে যদি তিনি দুঃখিত হ'বেন, তা'হলে এতদিন বিমলকে একটী সুপাত্রে দিতেন,—তা'হলে আজ মেয়ের বিবাহের জন্যে এমন করে ভা'বতাম না। বিমলের বাপই যে বিমলের অযত্ন কচ্চেন!'

সন্ধ্যা হইল। মনোরমা বলিলেন, "দিদি তবে আমি এখন চ'ললাম। কাল আর আ'সতে পা'রব না, ভাসুর থা'কবেন। তাই বলে তুমি যেন বোনটীকে ভুলে থেক না। সকালে ও বৈকালে ঘাটে যা'বার আগে ডেকে নিয়ে যেও। আর তোমরা কাল আমাদের বাড়ী খাবে, সুতরাং দিনের বেলায় অনেকক্ষণ তোমার কাছে থা'কতে পা'ব। তবে এখন আসি।" বিজয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন, "এস দিদি। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কাল তুমি আ'সতে পা'রবে না কি জন্য? এবাড়ীতে ভাসুর থা'কবেন ব'লে, না ওবাড়ীতে ঠাকুরপো থা'কবেন ব'লে?" মনোরমা হাসিতে হাসিতে প্রস্থান করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি নয়টার মধ্যে আহারাদি শেষ করিয়া, বিজয়া শয়ন গৃহে গেলেন। ধীরেন সন্ধ্যার সময় আহার করিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। বিমল তাহার ঠাকুরমার কাছে শুইয়াছে। ভবেশের খাবার প্রস্তুত করিয়া ঘরে রাখা হইয়াছে।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত বিজয়ার নিদ্রাকর্ষণ হইল না। নানাবিধ চিন্তা এবং উদ্বেগে তাঁহার মন আলোড়িত হইতে লাগিল। বিজয়া ভাবিতেছিলেন—'তিনি আসিলে, আজ তাঁহার কাছে মনের দুঃখ সব খুলিয়া বলিব, এবং প্রাণ ভরিয়া কাঁদিব; তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার দয়া হইবে। আজ হাতে ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিব, কি অপরাধে প্রাণেশ্বর এতদিন তাঁহার আশ্রিতদের ভুলিয়াছিলেন,—কি দোষে এত দীর্ঘকাল আমাদের প্রতি মুখ তুলিয়া চাহেন নাই। যদি দয়া করিয়া বলেন, তবে তাঁহার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিব। স্বামী দেবতা, অবশ্যই অজ্ঞের দোষ মার্জ্জনা করিবেন।' চিন্তা ও কল্পনাস্রোত ক্রমেই গভীরতর হইতে লাগিল। স্বামীর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া মার্জ্জনা পাইবেন, এবং এখন অবধি স্বামী যাহাতে পর হইতে না পারেন, সর্ব্বতোভাবে তাহার বিধান করিবেন; এই কল্পনায় সাধ্বী অপরিসীম সুখ উপভোগ করিতে লাগিলেন। ক্রমে রজনী অধিক হইল। পৃথিবী নিস্তব্ধ, জীবজন্তুর সাড়াশব্দ নাই। বিজয়া দেখিতে-

ছিলেন, চন্দ্রমা নক্ষত্র-পরিবেষ্টিত হইয়া ধীরে ধীরে পশ্চিম গগনে ডুবিতেছে,—জ্যোতিষ্ক-মণ্ডলী যেন তাঁহারই দিকে চাহিতে চাহিতে অস্তমিত হইতেছে। অল্পে অল্পে ধরা ঘোর তমসাচ্ছন্ন হইল। বিজয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন।

বিজয়া অর্দ্ধ-ঘটিকা ঘুমাইয়াছিলেন; অকস্মাৎ তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি মনুষ্য-পদশব্দ এবং কথোপকথন শুনিতে পাইলেন। তাড়াতাড়ি জানালার পাশে গিয়া দেখিলেন, হরিচরণ ও ভবেশ আসিতেছেন,—অগ্রে অগ্রে ভৃত্য আলো লইয়া আসিতেছে। বিজয়ার হৃদয় দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। যদি তিনি তৎকালে মনের স্থৈর্য্য না হারাইতেন, তাহা হইলে বুঝিতে পারিতেন যে, ভবেশের গতি স্থির নহে; সে টলিতে টলিতে আসিতেছে। বস্তুতঃ, ভবেশ আসিবার কালে মদ্যপান করিয়াছিল। হরিচরণ বহু চেষ্টা করিয়াও তাহাকে বিরত করিতে পারেন নাই,—শেষে এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিলেন, "দেখ ভবেশ! যদি মাতাল হ'য়ে বাড়ীতে নিপীড়িত মা কি স্ত্রীর প্রতি কোনরূপ অসদ্ব্যবহার ক'রেছ শু'নতে পাই, তাহ'লে আজীবন তোমার সহিত অসদ্ভাব থা'কবে।" ভবেশ বলিয়াছিল—"আরে, ভবেশচন্দ্র পেঁচী মাতাল ন'ন, এক আধ পেগে বেএক্তার হননা। আমি ঠিক থা'কব বাবা।" হরিচরণ জানিতেন না যে, ভবেশ ব্যাগের মধ্যে এক বোতল মদ লুকাইয়া আনিয়াছিল।

উভয়ে ভবেশের গৃহ-সান্নিধ্যে পৌঁছিলেন। ভবেশ দরজা নাড়িয়া ডাকিল 'মা, দোর খুলিয়া দাও।' পাড়ার কতকগুলা

জাগ্রত কুকুর মহা সোরগোল করিয়া উঠিল। ওদিকে হরি-চরণের পোষা কুকুরটীও সেই ধ্বনিতে কণ্ঠ মিশাইল।

ভবেশের মাতা জাগিলেন; তাড়াতাড়ি উঠিয়া 'বাবা তোমরা এলে' বলিয়া দ্বার খুলিলেন। দীর্ঘকাল পরে ভবেশ আজ সত্য সত্যই আসিয়াছে দেখিয়া, তাঁহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। হরিচরণ ভবেশের আগে আগে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। বিমল ঠাকুরমার সঙ্গে উঠিয়াছিল, খোকাও জাগিল। সকলে দালানে সমবেত হইলেন। 'বাবা' তাহার কাপড় ও পুতুল আনিয়াছেন, এই আশায় বিমল পুলকিতা, খোকার উৎসাহ রেলগাড়ী পাইবে বলিয়া; কিন্তু উভয়েই হরিচরণের পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইল। ভবেশ তাহাদের চক্ষে যেন নূতন লোক, তাহার কাছে যাইতে বিমল ও ধীরেন সঙ্কুচিত হইতেছিল। ভবেশ জামা খুলিয়া হাত পা ধুইতে গেল। হরিচরণ বিমল ও ধীরেনকে প্রার্থিত দ্রব্য দিয়া, সস্নেহ বচনে তাহাদের আবদার রক্ষা করিলেন। ভবেশের মাতার সহিত কিয়ৎক্ষণ কথোপ-কথন করিয়া "খুড়ীমা, তবে আমি এখন আসি, রাত হয়েচে" বলিয়া স্বগৃহে প্রস্থান করিলেন।

ভবেশ ভাল করিয়া কথা কহিতেছে না, এবং সকল প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর দিতেছে না। মাতা মনে করিলেন, বুঝি লজ্জা এ মৌনাবলম্বনের কারণ;—অনেক দিন বাড়ী আসে নাই, সেইজন্য হয়ত ভবেশ একটু বাধ বাধ বোধ করিতেছে। তিনি বলিলেন "বাবা, বিমল ও খোকা যে কতবার তোমার কথা জিজ্ঞাসা ক'রেচে, তা কি ব'লব?

তুমি কবে আ'সবে, কবে ওদের খেলার জিনিষ আ'নবে, কেবল সেই খোঁজই নিয়েচে।" ভবেশ কাহারও দিকে ভাল করিয়া চাহে নাই। সে 'হাঁ' 'না' প্রভৃতি শব্দ এবং কতকগুলি সমাপিকা ক্রিয়ার সাহায্যে মাতার স্নেহপূর্ণ প্রশ্নাবলীর উত্তর দিতেছিল।

ধীরেন ও বিমল এপর্য্যন্ত 'বাবার' কাছে যায় নাই। হরিচরণ যাই চলিয়া গেলেন, অমনি তাহারা আসিয়া ঠাকুরমার কাছে ঘেঁসিয়া দাঁড়াইল, এবং একদৃষ্টে ভবেশের ভাবগতি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। হরিচরণের কাছে তাহারা সাগ্রহে ছুটিয়া যাইত, কারণ, তাঁহার নিকট প্রাণভরা আদর পাইত। কিন্তু আজ ভবেশকে দেখিয়া অবধি, তাহারা কেমন একরূপ সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। তাহারা স্বতই বুঝিয়াছিল যে, তৎকালে 'বাবার' কাছে আদর মিলিবে না; সুতরাং ঈষৎ মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া পরস্পর সঙ্কল্প করিল যে, পরদিন প্রত্যূষে আগে 'বাবার' কোলে উঠিবে।

ভবেশের আহার শেষ হইলে, মাতা, বিমল ও ধীরেনকে লইয়া শয়ন করিতে গেলেন। বালক-বালিকা আপন আপন দ্রব্য লইয়া কিয়ৎকাল পরস্পরের মধ্যে বাগ্‌বিতণ্ডা করিল। ঠাকুরমা অবশেষে মধ্যস্থ হইয়া, তাহাদের বিসম্বাদ মিটাইয়া দিলেন। তাহারা অল্পক্ষণ পরে নিদ্রিত হইল।

এদিকে ভবেশ শয়নগৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে, একবার বহির্ব্বাটী যাইয়া গোপনে সুরা-পান করিয়া আসিল।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভবেশ শয্যায় উপবেশন করিল। শয্যার একপার্শ্বে জড়-সড় ভাবে বিজয়া বসিয়া আছেন। ভবেশকে যাহা যাহা বলিবেন সংকল্প করিয়াছিলেন, সব ভুলিয়া গিয়াছেন। বুঝি, ভবেশ আদর করিয়া মিষ্ট-বচনে সম্ভাষণ করিলে, বিজয়ার এ বাধ বাধ ভাবটা দূর হয়,—তাহা হইলে সাধ্বী প্রাণ ভরিয়া কাঁদিয়া, নিষ্ঠুরের কঠোর অন্তঃকরণ দ্রব করিতে পারেন। কিন্তু নির্দ্দয় ভবেশ কথা কহিল না। বিজয়ার মানসিক অস্থৈর্য্য উত্তরোত্তর বাড়িতে লাগিল। তিনি অধিকক্ষণ এ পীড়াদায়ক নিস্তব্ধতা সহ্য করিতে না পারিয়া, ধীরে ধীরে দীনভাবে স্বামীর মুখপানে চাহিলেন। ভবেশ এবার জিজ্ঞাসা করিল "কি গো, মুখ বুজে রইলে কেন? কেমন আছ?"

কিন্তু হায়! সে প্রশ্নে হৃদয়ের ব্যথা নাই, সরলতা নাই, প্রেমিকের প্রাণের আবেগ নাই। তাহাতে তৃষাতুরা চাতকীর পিপাসা মিটিল না। ভবেশ কথাকয়টী সন্তর্পণে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, কিন্তু বিজয়া সুরার গন্ধ পাইলেন। স্বামী মাতাল, এই ভাবিয়া বিজয়ার অপরিসীম মনঃপীড়া জন্মিল; তথাপি মনোভাব দমন করিয়া উত্তর দিলেন "বেঁচে আছি, এই পর্য্যন্ত। তুমি এতদিন আমাদের ভুলেছিলে, একবারও আমাদের খবর নাওনি,—এরূপে বেঁচে থাকার চাইতে মরণ হ'লেই ভাল ছিল।" ভবেশ বিরক্ত হইল। এরূপ দুঃখের

কাহিনী সে শুনিতে আসে নাই; এসব তাহার মনে স্থান পায় না, এবং ইহাতে সে অভ্যস্তও নহে। এদিকে মদ্যের প্রভাবে তাহার মস্তিষ্ক উত্তেজিত হইতেছিল। পশুভাব অল্পে অল্পে তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া ফেলিল। সে দগ্ধমরু প্রায় হৃদয়ে বিজয়ার দুঃখাশ্রু-বিন্দু স্পর্শ করিতে না করিতে উড়িয়া গেল,—তথায় কোমল স্নেহলতিকা উষ্ণবায়ু সংস্পর্শে শুষ্ক হইয়া উঠিল।

ভবেশ বিরক্তি-সহকারে বলিল, "পাড়াগেঁয়ে মেয়েদের একরকম ধরণই আলাদা; দিবারাত্র কেবল প্যান্ প্যান্ আর কাঁদুনী গাওয়া;—যা' দে'খ্তে পারি না, তাই! অনেক দিন পরে বাড়ী এলাম, প্রাণভরে হাঁস, দুটো সরস কথা বল, যে বাড়ী আসা সার্থক হ'ক্! তা' নয়, কেবল চোখের জল আর দীর্ঘনিশ্বাস!"

অভাগিনী বিজয়ার মন ভাঙ্গিয়া গেল। সে নিষ্ঠুর-বচনে তাঁহার হৃদয়ের শেষ আশা টুকু লুপ্ত-প্রায় হইল। তিনি চুপ করিয়া ছিলেন,—মনে মনে ভাবিলেন, 'হায় ভগবান, এ যে হিতে বিপরীত হইতে চলিল!"

ভবেশ পরক্ষণেই আরম্ভ করিল—"বাবা, এই জন্যেইত বাড়ী আ'সতে চাই না। যত পাড়াগেঁয়ে পেঁচী, না জানে কথা কইতে, না জানে ব্যবহার; কেবল মুখ গুঁজে ব'সে থা'ক্বে। 'লভ' হ'বে কিসে বাবা! থা'কত বিরাজ, ত এতক্ষণ ফূর্ত্তির ফোয়ারা খু'লত! হ'রে ছোঁড়া ছা'ড়বে না, বাড়ী আসার জন্যে জেদাজেদি! এই সব রসিকাদের সহবাসে কি যে সুখ, তা' সেই জানে!"

বিজয়া স্থির, নিস্পন্দ। তাঁহার হৃদয় শুষ্ক হইয়া গেল; শরীর দুরু দুরু কাঁপিতে লাগিল। তিনি বুঝিলেন, স্বামীর মনোভাব ফিরান দেবেরও অসাধ্য; সুতরাং মনে মনে স্বীয় ভবিষ্য-সুখ-আশায় জলাঞ্জলি দিয়া, সাহস পূর্ব্বক সংসারের দায়িত্ব কথা পাড়িলেন। বিজয়া বলিলেন, "বিমল বড় হ'য়েচে, বিবাহ শীঘ্র না দিলে নয়, লোকে নিন্দা কচ্চে। এবার তা'র বে'র একটা ব্যবস্থা ক'রবে না?" আহা! অভাগিনী স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, ভবেশ মত্ততার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছে। কিন্তু সরলা কি জানিতেন যে, কিরূপ ব্যবহারে তাহার তাৎকালিক পাশব নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি পাইবে, এবং কি উপায়েই বা তাহা উপশমিত হইবে? ভবেশ মেয়ের বিবাহের কথা শুনিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ক্রোধ-কম্পিত স্বরে বলিল, "কিসের মেয়ের বিয়ে! মেয়ের বিয়ে, মেয়ের বিয়ে ক'রে জ্বালাতনটাই কল্লে,—সবারই মুখে ওই বুলি! মেয়ে আপন পথ দেখে নেবে; তা'র বিয়ের ভাবনায় মাথা ঘামিয়ে কি আমাকে পাগল হ'তে বল! ম'রতে বাড়ী এসেছিলাম! হ'রে ছোঁড়া আমার পরম শত্রু,—সেই ত এই সব জ্বালাতন ভোগ করাতে আমাকে বাড়ী এনেচে! আমি কি আপনা হ'তে এসিচি? যাহ'ক বাবা, এই শেষ আসা।" এইরূপ বলিতে বলিতে ভবেশের মস্তিষ্ক তড়িদ্বেগে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল।

বিজয়া ত্রস্ত, উদ্বিগ্ন, হতবুদ্ধি! ভবেশ যে এত চটিয়া উঠিবে, তিনি তাহা একবারও ভাবেন নাই। ভয়ে ভয়ে অতি সন্তর্পণে বলিলেন,—"তুমি মেয়ের বাপ, মেয়ের বিবাহের

কথা তোমাকে না ব'লে আর কা'কে ব'লব? তা' তুমি যখন রাগ কচ্চ, তখন আর ব'লব না।"

"আবার মেয়ের বিয়ে! আবার ঐ কথা! দূর হ' মাগী আমার সম্মুখ থেকে" বলিয়া সক্রোধে ভবেশ বিজয়াকে পদাঘাত করিল। দারুণ আঘাতে মূর্চ্ছিতা হইয়া, অভাগিনী পর্য্যঙ্ক হইতে ভূতলে নিপতিতা হইলেন। দুর্ব্বৃত্তের অত্যাচার চূড়ান্ত-সীমায় উপনীত হইল!

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

সেই রজনীতে যৎকালে কোমল-প্রাণা সাধ্বী বিজয়ার সুখলতা উৎখাত-মূল করিয়া, পতিসোহাগ-তৃষ্ণাতুরা বহুনিগৃহীতা রমণীর সুখভোগ কল্পনায় মর্ম্মভেদী নিষ্ঠুরতার শেষ যবনিকা নিক্ষেপ করিয়া, পূর্ব্বলিখিত ঘটনা সংঘটিত হইয়া গেল, ঠিক সেই সময় হরিচরণের গৃহে এক পবিত্র সুখাভিনয় হইতেছিল।

খগেন ঘুমাইতেছে। হরিচরণ ও মনোরমা কথোপকথন করিতেছেন। মনোরমা আধ হাসি, আধ আদরমাখা বচনে স্বামীকে বলিলেন, "তুমি যদি রাগ না কর, ত একটা কথা বলি।" হরিচরণ উত্তর দিলেন, "তুমি যদি না বল, তবে আমি রাগ করিব।" মনোরমা বলিলেন,—"তুমি আর বৎসর আমার অনন্তের জন্য যে পঞ্চাশ টাকা পাঠিয়েছিলে, তা' আমি কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের স্ত্রীকে ধার দিইছিলাম, কিন্তু তখন তোমাকে বলিনি।" "বড় অন্যায় কাজ করেছিলে, তা'র

এই শাস্তি” বলিয়া, হরিচরণ প্রিয়তমার মুখচুম্বন করিলেন। মনোরমা হাসিয়া বলিতে লাগিলেন—“আঃ, কথাটা আগে শেষই কত্তে দাও। সেই সময় তাঁ'র মেয়ের বিবাহ তোমার মনে আছে বোধ হয়? কিন্তু টাকার অভাবে বিবাহ বন্ধ হ'বার উপক্রম হ'ল। কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের স্ত্রী আমার কাছে এসে কাঁ'দতে লা'গলেন, এবং কাতরস্বরে ব'ললেন ‘মা, যা'তে আমার জা'ত রক্ষা হয়, এবং এ বিপদ থেকে উদ্ধার হই, তা'র একটা উপায় তুমি কর।' আমি তাঁ'র চখের জল, এবং দুঃখ দেখে স্থির থা'কতে পা'রলাম না; পঞ্চাশটী টাকা তাঁ'র হাতে দিয়ে ব'ললাম, ‘আমার যা ছিল, আপনাকে দিলাম, এতে যদি কোন উপকার হয়, তবে বড়ই সুখী হ'ব।' তিনি টাকা ক'টী পেয়ে আহ্লাদে কত যে আশীর্ব্বাদ ক'রলেন, তা' কি ব'লব। তা'রপর মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। আহা! ওঁরা বড় গরিব; বিশেষ সম্প্রতি কৃষ্ণ ভট্টাচার্য্যের মৃত্যু হওয়ায়, ওঁদের সংসার চলা কষ্টকর হ'য়ে পড়েচে। ব্রাহ্মণী এপর্য্যন্ত কষ্টে পঁচিশটী টাকা দিয়েচেন; সব শোধ কত্তে সাধ্যমত চেষ্টা ক'রচেন, কিন্তু পেরে উঠ্‌চেন না। তুমি যদি বিরক্ত না হও, তা' হ'লে আমার এই প্রার্থনা যে, বাকি টাকাটা নিয়ে কাজ নাই।”

হরিচরণ অভিনিবেশ সহকারে প্রিয়ার এই দয়াশীলতার কথা শুনিতেছিলেন। মনোরমার কথা শেষ হইলে, হরিচরণ প্রগাঢ় অনুরাগভরে তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন, এবং মুখচুম্বন করিয়া বলিলেন,—“এ বিষয়ে আমার মত লওয়ার প্রয়োজন কি মনোরমে! সে টাকা তোমার;—তুমি তা'র

এমন সদ্ব্যবহার করেচ শুনে যে কত সুখী হ'লাম, তা' ব'লতে পারি না। ভগবান স্বয়ং তোমার এ পুণ্য-কার্য্যের পুরস্কার দিবেন!" হরিচরণ পুনঃ পুনঃ মনোরমার চাঁদমুখ চুম্বন করিয়া, আবার বলিতে লাগিলেন—"মনোরমে, আজ তোমার কাছে যে পবিত্র নীতি-শিক্ষা পেলাম, তা' জীবনের আদর্শ ক'রব। আমরা কঠোর সংসারী হ'য়ে অনেক সময় ঘোর স্বার্থপর হ'য়ে পড়ি,—দয়া ধর্ম্ম ভুলে যাই। সেই সময় আমাদের কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ভার ভগবান তোমাদের ওপর দিয়েচেন। বস্তুতঃ, দয়ার রাজ্যে স্ত্রীলোকই রাজা। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, অতি অল্প লোকের ভাগ্যে সেরূপ স্ত্রী-সম্মিলন হয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিই যে, ও সম্বন্ধে আমি পরম সৌভাগ্যবান্।"

মনোরমা হর্ষে গদগদ হইয়া মনে মনে ভাবিলেন—'স্বামিন্, ভগবান তোমাকে সুখী ও দীর্ঘজীবী করুন। তোমার যত্নোপার্জ্জিত অর্থ লইয়া আমি অন্যের উপকার করিয়াছি, বস্তুতঃ তোমার কাজ আমি করিয়াছি; পুণ্য যদি কিছু থাকে, সে তোমারই। প্রভো, তোমার আশ্রয়ে সুখপালিত হ'য়ে, সেই পুণ্যের কেবল ছায়াভোগ টুকু প্রার্থনা করি, এবং তাহাতেই চরিতার্থ হইব।' স্বামীর আদরে সোহাগিনীর সুখের সীমা নাই।

অতঃপর সাংসারিক কথা আরম্ভ হইল। আগামী বৎসর ভিতর বাটীতে দুইটী নূতন কুঠরী করিতে হইবে; সনাতন বিশ্বাস উত্তর মাঠের যে জমিটুকু চাষ করিত, তাহা ছাড়িয়া দিয়াছে; সে জমিটা এবার খাজনা না করিয়া একটা বাগান

করিলে হয়; পুষ্করিণীটার পঙ্কোদ্ধার করিয়া, সেই মাসেই মৎস্য ছাড়ার বন্দোবস্ত করা চাই, ইত্যাদি পরস্পর অনেক কথা হইল। প্রস্তাবগুলি উভয়েরই সম্পূর্ণ অনুমোদিত। দম্পতির বর্ত্তমান সুখ-সাচ্ছন্দের কোন অভাব নাই, সুতরাং তাঁহারা ভবিষ্য সুখবিধানে অভিনিবিষ্ট।

মনোরমা বলিলেন,—"কাল ব্রতের জন্য কয়েকজন ব্রাহ্মণ খাওয়াতে হ'বে; ভাসুর, দিদি, বিমল প্রভৃতিকে এই সুযোগে নিমন্ত্রণ করা স্থির হয়েচে; অনেকদিন ওঁদের খাওয়ান হয়নি।" হরিচরণ উত্তর দিলেন—"বেশত, কাল সকালে মাঠে জমি দেখতে যা'বার আগে আমি ভবেশকে ব'লে যাব, তুমি মেয়েদের নিমন্ত্রণ করো।"

এবার ভবেশের কথা উঠিল। মনোরমা বিজয়াদিদির সুখচিত্র কল্পনার চক্ষে দেখিতেছিলেন, স্বামীকে তাহার আভাস দিয়া কতই আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। হরিচরণ কেবল বলিলেন,—"ভগবান করুন, যেন ঐরূপই হয়; কিন্তু ব'লতে কি, মদ্যপানে এবং কুক্রিয়ায় ভবেশের এত অধঃপতন হয়েচে, এবং তা'র চরিত্র এরূপ পশুভাব ধারণ করেচে যে, তা'র মতিগতি ফিরান সহজসাধ্য বোধ হয় না। তবে পতিব্রতার অসাধ্য কিছুই নাই।"

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রাতে হরিচরণ ভবেশের গৃহে আসিয়া, যে অচিন্তিতপূর্ব্ব শোচনীয় দৃশ্য অবলোকন করিলেন, তাহাতে তাঁহার হৃদয় স্তম্ভিত হইল। তিনি দেখিলেন, ভবেশ গৃহ-ত্যাগের উদ্যোগ করিতেছে। ক্রোধ, ঘৃণা এবং উত্তেজনা তাহার মুখের স্বাভাবিক নিষ্ঠুরভাব শতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে; সে ব্যস্তভাবে ব্যাগে কাপড় চোপড় পুরিতেছে। ভবেশের মাতা অশ্রুপূর্ণ-নয়ন মৃত্তিকার্পিত করিয়া, হতাশভাবে এক-পার্শ্বে বসিয়া আছেন। বিমল ঠাকুমার কাছে উপবেশন করিয়া, অবাক্ হইয়া পিতার কার্য্যকলাপ দেখিতেছে, যেন কি হইল, কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। বালিকার চক্ষু ছল ছল করিতেছিল। বিজয়া ভবেশের পদাঘাতে ঘরের মেঝের উপর যেভাবে পড়িয়াছিলেন, সেইরূপেই পড়িয়া আছেন। ধীরেন তাঁহার কাছে বসিয়া 'মা' 'মা' করিয়া কাঁদিতেছে। ভবেশ ব্যতীত আর সকলের চক্ষে জল এবং প্রাণে হুতাশ।

এই শোকদৃশ্যে, হরিচরণের কোমল অন্তঃকরণ বিষাদে অবসন্ন হইয়া গেল। তিনি মুহূর্ত্তমধ্যে প্রকৃত ঘটনা কল্পনায় দেখিলেন, এবং ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—"খুড়ীমা, একি! কি হয়েচে! ভবেশ তুমি কোথা যাচ্ছ!" ভবেশ হরিচরণের দিকে না চাহিয়াই কর্কশস্বরে উত্তর দিল,—"বিশেষ দরকার

হওয়ায় আমাকে এখনই কলিকাতায় রওনা হ'তে হ'বে।" হরিচরণের বিস্ময় অপনোদিত হইবার পূর্ব্বেই, ভবেশ ব্যাগ-হস্তে গৃহত্যাগ করিল। তাহার গাত্র হইতে উৎকট সুরার গন্ধ বাহির হইতেছিল।

দুর্বৃত্ত গৃহত্যাগ করিল, সঙ্গে সঙ্গে সেই অভিশপ্ত সংসারের জীর্ণ আশ্রয়স্তম্ভও যেন ভিত্তিচ্যুত হইল। ভবেশের হতভাগ্য পরিবার স্বতঃই বুঝিল যে, ভবেশ আজ তাহাদিগকে জন্মের মত ত্যাগ করিল। বৃদ্ধা মাতা ভাবিলেন, উপযুক্ত পুত্র থাকিতেও আজ তিনি পথের ভিখারিণী; বিজয়া মনে করিলেন, স্বামী থাকিতেও তিনি অনাথিনী চিরদুঃখিনী হইলেন। ছেলে ও মেয়েটীর উপায় কি হইবে, কে তাহাদের খাইতে পরিতে দিবে, এই ভাবিয়া বিজয়া মনের আবেগ রাখিতে পারিলেন না, অজস্র অশ্রু-বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভবেশের মাতাও দুই বাহুর মধ্যে মুখ লুকাইয়া কাঁদিলেন। একই চিন্তা উভয়ের হৃদয় নিপীড়িত করিতেছিল। প্রাঙ্গণে পালিত কুকুরটী করুণরব করিয়া ইতস্ততঃ ঘুরিতে লাগিল। সেও আজ অসহায়, সেও সেই হতভাগ্য পরিবারের গভীর নৈরাশ্যের অংশভাগী হইয়াছিল। বস্তুতঃ সেই মর্ম্মভেদী শোকোচ্ছাস গৃহের বায়ুতে পরিব্যাপ্ত হইয়া তাহাকে যেন কলুষিত করিল।

হরিচরণের চক্ষে জল আসিল। তিনি চক্ষু মুছিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে সকলকে প্রবোধ দিয়া, 'কি হইয়াছে' জিজ্ঞাসা করিলেন। ভবেশের মাতা গতরাত্রির ঘটনা একরূপ ভবেশের মুখেই শুনিয়াছিলেন। প্রভাতে বধূমাতাকে ম্রিয়মানভাবে

ঘরের মেঝেয় পতিত, এবং ক্রোধাকুল ভবেশকে গৃহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প দেখিয়া, বৃদ্ধা ব্যস্তসমস্ত হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভবেশের আকৃতিতে তৎকালে মত্ততার সমুদয় লক্ষণ বর্ত্তমান ছিল; তাহার চক্ষু ঈষৎ রক্তবর্ণ, কথা মদিরা-গন্ধ-সংস্পৃষ্ট এবং ঈষৎ জড়িত। দুর্বৃত্ত বিজয়াকে লক্ষ্য করিয়া পরুষ ভাষায় বলিল,—"ঐ মাগীর জন্যেইত বাড়ী আসা একরকম বন্ধ করিছিলাম; মাগীর মুখে 'মেয়ের বিয়ে' ছাড়া আর কোন কথা নাই। দু'দিনের জন্যে বাড়ীতে আরাম কত্তে এলাম, তবুও 'মেয়ের বিয়ে' 'মেয়ের বিয়ে' ক'রে জ্বালাতন! এবার জন্মের মত বাড়ী আসা ছা'ড়লাম!" ভবেশের মাতা এই কথা শুনিয়া ব্যাকুলভাবে বলিলেন, "সে কি বাবা! ষষ্ঠীর দাস! অমন অমঙ্গলের কথা কি মুখে আ'নতে আছে! তোমার ঘর দোর, তোমারই সব, তুমিই আমাদের সকল আশা ভরসা; তুমি আমাদের না দে'খলে আর কে দেখবে? বৌমা না বুঝে একটা কথা ব'লে ফেলেচেন, তা'তে কি তোমার রাগ কত্তে আচে! মেয়ে বড় হয়েচে, তা'র বিয়ের ভাবনায় মা আমার সদাই ব্যস্ত, তাই তোমাকে ওকথা বলেচেন। তা' তোমারই মেয়ে, সে চেষ্টা তুমিই ক'রবে; আমরা উপলক্ষমাত্র বইত নই। তুমি ব'স বাবা, রাগ ক'রো না; অনেকদিন পরে এসেচ, আজ এরকম রাগ ক'রে কি বাড়ী থেকে যেতে আচে!" ভবেশ ক্রোধভরে মা'র দিকে চাহিয়া বলিল—"মা, তোমারও মুখে ওই কথা! মেয়ের বিয়ে ছাড়া আর কোন কথা নাই! ভাল, তোমরা থাক, মেয়ের বিয়ে দাও! এই আমি জন্মের

মত্‌ চ'ল্‌লাম!" মাতা কত কাকুতি-মিনতি করিলেন, কত সাধ্যসাধনা করিলেন, নিষ্ঠুর ভবেশ কিছুতেই কর্ণপাত করিল না।

ভবেশের এই অমানুষী নিষ্ঠুরতার কাহিনী শুনিয়া, হরিচরণের শোণিত শুষ্কপ্রায় হইল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অবসন্ন হৃদয়ে সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। কয়েকবিন্দু তপ্তাশ্রু তাঁহার কপোল বাহিয়া পড়িল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল, এ ঘোর পাপাগ্নিতে সংসার অচিরাৎ ভস্মীভূত হইবে। যে সংসারে পুত্র মাতার অপার্থিব বাৎসল্য, স্বামী সহধর্ম্মিণীর স্বর্গীয় প্রেম, পিতা পুত্র কন্যার অতুলনীয় স্নেহ, এরূপে হেলায় পদদলিত করিয়া পাপজীবন যাপনে লালায়িত হয়, তাহার লয় আসন্ন! সাধু হরিচরণের বোধ হইল, যেন বায়ু হলাহল উদ্গীরণ করিতেছে, বিহঙ্গ-কূজন বিষবর্ষণ করিতেছে! জন-কোলাহল তাঁহার নিকট জগৎবিধ্বংসী রণ-কোলাহল স্বরূপ প্রতীয়মান হইতে লাগিল।

বিমল এখন আর অবোধ বালিকাটী নহে। সে সকল শুনিতেছিল। তাহার মনোমধ্যে এক ভীষণ ঝটিকাপ্রবাহ ছুটিতে লাগিল। বিমল বুঝিল, সে-ই সকল অশান্তির মূল। পিতামহীর কথা শেষ হইলে সে কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া গিয়া বিমল মায়ের কাছে বসিল, এবং বলিল—"মা, তুই কেন এমন কল্লি! বাবা যা'তে রাগ করেন, এমন কথা কেন ব'লতে গেলি! দেখ বাবা তোকে মেরেচেন, আর কখন বাড়ী আ'সবেন না বলেচেন! আমার বিয়ে দিলে কে তোর কাছে থা'কবে, কে তোকে যত্ন

ক'রবে।" বিমল আর কিছু বলিতে পারিল না; শ্রাবণের ধারার ন্যায় অজস্র অশ্রু তাহার বসন সিক্ত করিল। বালিকা দারুণ মনোকষ্টে অভিভূতা,—প্রবীণার মত আজ সে সংসার-বন্ধন অনুভব করিতেছিল।

হরিচরণ মনঃস্থির করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে সকলকে বুঝাইলেন যে, ভবেশ কেবল রাগভরে কর্কশ কথা বলিয়া গিয়াছে; সত্যই কি সে তাহার মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা ত্যাগ করিবে? মানুষে তাহা কখন পারে না। তবে অজ্ঞানে মানুষ কখন কখন পশুবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে, জ্ঞান হইলে অনুতপ্ত হয়। হরিচরণ বুঝাইলেন যে, ভবেশ সংসারধর্ম্ম সকলই করিবে, নিয়মিত সংসার খরচ দিবে, এবং যাহাতে সে বাড়ী আসে, তদ্বিষয়ে তিনি যত্নবান্ থাকিবেন। সকলে কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলে হরিচরণ বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার নিকট এই অভাবনীয় দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া, মনোরমা এবং হরিচরণের মাতা আশ্চর্য্যান্বিত ও মর্ম্মাহত হইলেন। মনোরমা ভবেশের গৃহে আসিয়া সকলের সহিত সাশ্রুনেত্রে প্রাণের সহানুভূতি দেখাইয়া, একে একে সকলকে প্রবোধ দিলেন। সেই পুণ্যবতীর সরল আশ্বাস-বচনে ক্রমে অভাগিনীরা সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। মনোরমা ও হরিচরণের মাতা পরমযত্নে সেই ব্যথিত পরিবারকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া গেলেন, এবং মনোরমা স্বহস্তে রন্ধনাদি করিয়া, বালক বালিকাদিগকে আহার করাইলেন। বিজয়া ও ভবেশের মাতা সেদিন কিছুই আহার করিলেন না।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

কৃত্তিবাসের বাসস্থান, পলাসপুর—চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তবর্ত্তী একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। গ্রামখানি রেলওয়ের পশ্চিমাংশে এবং নিকটবর্ত্তী ষ্টেশন হইতে চারি মাইল দূরে। একটী সুদীর্ঘ মেটে রাস্তা ষ্টেশনের সহিত ধূলিময় গ্রামের সংযোগ বিধান করিয়াছে। রাস্তার আশে পাশে স্থানে স্থানে আম্র বা বংশ কানন, কোথাও বিস্তীর্ণ মাঠ, কোথাও বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়। রাস্তাটীর এমন কিছু প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ছিল না যে, দর্শকের চিত্ত আকর্ষণ করে, কিন্তু বিজয়ার নিকট সে দৃশ্য পরম রমণীয় বোধ হইত। পিত্রালয়ে যাইবার পথে যেখানে যে বাগানটী বা পুষ্করিণীটী বা বড় অশ্বত্থগাছটী ছিল, তাহা সর্ব্বদা বিজয়ার মানসপটে অঙ্কিত থাকিত। সে সকল স্মৃতি কি মধুর! পিতামাতার স্নেহের কথা, এবং পিতৃগৃহের কথা মনে হইলে, সঙ্গে সঙ্গে এই পথ এবং তাহার প্রাকৃতিক দৃশ্য বিজয়ার মনে জাগরূক হইত,—তিনি একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেন। মনোরমা বিজয়ার কাছে অনেকবার এই পথটীর বিবরণ শুনিয়াছিলেন, এবং শুনিয়া শুনিয়া তাহার একটা পরিস্ফুট ধারণাও করিয়া ফেলিয়াছিলেন।

পলাসপুরে তিন-চারি ঘর মাত্র ব্রাহ্মণের বাস; সুতরাং কৃত্তিবাস যে প্রভূত সম্মানের সহিত বাস করিতেন, বলা বাহুল্য। এ সম্মান তাঁহারা পিতৃ-পিতামহ-ক্রমে পাইয়া আসিতেছেন,

এবং অধুনা কৃত্তিবাসও চরিত্রগুণে তাহা অব্যাহতরূপে রক্ষা করিয়াছেন। পলাসপুরের * * খাঁ নামক কোন সমৃদ্ধিশালী ব্যবসাদার কলিকাতায় থাকিতেন। তাঁহার বিনীত আগ্রহে পরম আপ্যায়িত হইয়া, কৃত্তিবাস কলিকাতায় তাঁহার বাসায় অবস্থান করিতেছিলেন। কৃত্তিবাসের বাসা হরিচরণের বাসা হইতে অনেকটা দূর।

কৃত্তিবাসের বয়ঃক্রম এক্ষণে ত্রিশ বৎসরের অনধিক। তিনি বলিষ্ঠদেহ, এবং দেখিতে সুপুরুষ। অল্পবয়সে পিতৃ-বিয়োগ হেতু কৃত্তিবাসের লেখা পড়া রীতিমত সমাধা হয় নাই। এণ্ট্রান্স পাস করার পরই তাঁহাকে বিদ্যালয় ছাড়িতে হইয়াছিল। কিন্তু অল্পশিক্ষিত কৃত্তিবাসের স্বভাব যে সমুদয় সদ্‌গুণে মণ্ডিত হইয়াছিল, ইদানীং অনেক পূর্ণশিক্ষিত যুবকের চরিত্রে তাহার শতাংশের একাংশও দেখিতে পাওয়া যায় না। যে শিক্ষায় চরিত্রের সংশোধন এবং উৎকর্ষ-সাধন না হয়, তাহা প্রকৃত শিক্ষা বলিয়াই ধর্ত্তব্য নহে। সুতরাং অল্পশিক্ষিত চরিত্রবান্ কৃত্তিবাস আমাদিগের নিকট, চরিত্রহীন এম্‌-এ উপাধিক বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শীর্ষস্থানীয় গ্রাজুয়েট অপেক্ষা শত-গুণে সম্মানার্হ। কৃত্তিবাসের বিস্ফারিত নয়নযুগলে যৌবনের তেজ এবং হৃদয়ের উদারতা বিভাসিত হইত।

কিন্তু অবিমিশ্র সুখ এ সংসারে কে কবে ভোগ করিয়াছে? আজ কয়েক বৎসর হইতে তাঁহার প্রশস্ত ললাট বিষাদ-ছায়াবৃত হইয়াছিল। কৃত্তিবাস আজকাল বড় বিষণ্ণ। প্রাণাধিকা ভগিনীর দুঃখের কথা মনে হইলে, গভীর বিষাদে তাঁহার মুখ ম্লান হইয়া যায়। কৃত্তিবাসের পিতামাতা নাই।

বাড়ীতে পরিবারের মধ্যে স্ত্রী ও একমাত্র শিশু পুত্র, এবং লক্ষ্মীনাম্নী এক পরিচারিকা। কৃত্তিবাসের এক বিধবা মাতুলানী মাঝে মাঝে পলাসপুরে আসিয়া, কিছুদিনের জন্য তাহাদিগকে দেখিয়া শুনিয়া যাইতেন, এবং কৃত্তিবাসের স্ত্রীর এক কনিষ্ঠা ভগিনী, কখন কখন অল্পদিনের জন্য ভগিনীর গৃহে আসিয়া বাস করিতেন। সুতরাং সেই ক্ষুদ্র পরিবার একরূপ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত। ছুটী হইলে কৃত্তিবাস বাড়ী যাইয়া তাহাদিগকে দেখিয়া আসেন। কৃত্তিবাস ধনী না হইলেও, তাঁহার ক্ষুদ্র সংসার পূর্ণ শান্তি এবং সুখের আগার। সে সংসারে স্ত্রী স্বামীর প্রণয়ে সুখিনী, স্বামী স্ত্রীর প্রেমে গাঢ়বদ্ধ, সন্তান পিতামাতার পবিত্র স্নেহে পরিবর্দ্ধিত।

কে বলে ধন না থাকিলে মানুষের সুখ হয় না। যাহার সে বিশ্বাস, তাহাকে হরিচরণ ও কৃত্তিবাসের সংসার একবার দেখিতে বলি, তাহা হইলে সে মহাভ্রম দূর হইবে। জিজ্ঞাসা করি, কয়জন ধনী এ সংসারে প্রকৃত সুখী? এমন শত শত লক্ষপতি আছেন, যাঁহারা হরিচরণ বা কৃত্তিবাসের সহিত দশা পরিবর্ত্তনে আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ মনে করিবেন।

কিন্তু হইলে কি হয়, এমন সুখময় সংসারের একমাত্র অভিভাবক হইয়াও, কৃত্তিবাস অধুনা ঘোর অসুখী। ভগিনীর অযত্নের কথা মনে হইলে দারুণ ক্ষোভে তিনি অস্থির হন। আহা! তাঁহারা পিতামাতার কেবলমাত্র দুইটী সন্তান, এবং শিশুকাল হইতে পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় স্নেহবদ্ধ। কৃত্তিবাস বিজয়ের নাম করিতে অজ্ঞান হন, বিজয়াও দাদার কথা সর্ব্বদা বলেন। দাদা তাঁহার তত্ত্ব করিতে দেরি করিলে,

বিজয়া অভিমান করেন; অভিমানের সঙ্গে সঙ্গে দাদার কাছেই দাদার নামে অনুযোগ উপস্থিত হয়। দাদা সহস্র গুণ আদর করিয়া ভগিনীর অভিমান ভাঙ্গেন। সেই স্নেহের পুতলী ভগিনী সচরাচর স্বামীর হস্তে পড়িয়া, ঘোর লাঞ্ছিত ও মর্ম্মপীড়িত হইতেছে, স্নেহবান্ ভ্রাতা সে কথা মনে করিয়া, কিরূপে দীর্ঘশ্বাস নিরুদ্ধ করিবেন! কৃত্তিবাস ভাবিতেন— 'হায়! এমন যত্নবর্দ্ধিত কনকলতাকে পিতা বিষতরুর গায় কেন জড়িত করিলেন? কি করিলে এ জীবনে সেই গভীর ভ্রমের অপনোদন হয়!' অবোধ! এ ভুল যে আর কিছুতেই সংশোধিত হইবার নহে!

ভবেশের সহিত কৃত্তিবাসের শেষ দেখা, পাঠকবর্গ জানেন। তাহার পর তিনি আর ভবেশের কাছে আসেন নাই। কিন্তু ভগিনীর অসহায় অবস্থার প্রতীতির সঙ্গে তাঁহার প্রতি কৃত্তিবাসের স্নেহ ও যত্ন শতগুণ বাড়িয়াছিল। ভগিনীর সংসারের ব্যয়ভার তিনি ইদানীং স্বীয় স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিজয়াকে তিনি সর্ব্বদা পত্র লিখিতেন, তাঁহার যখন যাহা দরকার, তখন তাহার খোঁজ লইতেন, এবং স্নেহপূর্ণ ভাষায় তাঁহার তাপিত হৃদয়ে কথঞ্চিৎ শান্তিসুধা সিঞ্চন করিতেন। ভগিনী যাহাতে দৈন্যদশা অণুমাত্রও বুঝিতে না পারেন, কৃত্তিবাস সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার বিধান করিয়াছিলেন।

কৃত্তিবাস একদা বিজয়াকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে, তাঁহার বড় ইচ্ছা, বিজয়া ও তাঁহার ছেলে মেয়েকে এই সময় একবার পলাসপুরে লইয়া যান, এবং বিজয়ার মত হইলে,

ভবেশের নিকট সে প্রস্তাব করেন। বিজয়া তৎসম্বন্ধে ভ্রাতৃদ্বয়কে এইরূপ লিখিলেন—"ভাই, দাদা আমাদের ওবাড়ী লইয়া যাওয়ার কথা লিখিয়াছেন। আমার ওখানে যাইতে বড় ইচ্ছা; কিন্তু এখন ও বাড়ী গেলে, পাছে চিরজীবনের মত স্বামীর বিষদৃষ্টিতে পড়ি, এই ভয়ে বাড়ী যেতে মন সরিতেছে না। আমার দুঃখের অবস্থা তোমরা সকলই জান। স্বামীর ভালবাসা একরূপ হারাইতে বসিয়াছি। যদি কখনও তাহা ফিরিয়া পাইবার সম্ভাবনা থাকে, তবে সে এখান হইতে। তোমরা যাহা ভাল বিবেচনা কর, লি'খবে। দাদাকে অনেকদিন দেখিনি; একবার তাঁহাকে সুযোগমত এখানে আসিতে বলিবে।" কৃত্তিবাস ভগিনীর এই সুবোধ উত্তরের যৌক্তিকতা অনুভব করিয়া, ঈষৎ বিচলিত হইলেন, এবং লিখিলেন—"বিজয়, তোমার উত্তর বুদ্ধিমতীর মত হইয়াছে। এখন তোমাদের ওখানে থাকা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমার সংসার সুখের সংসার হউক; কিছুদিন পরে তোমাদের বাড়ী লইয়া আসিবার বন্দোবস্ত করিব। আমি শীঘ্র তোমাদিগকে দেখিতে যাইব।"

ইতিমধ্যে পূর্ব্ব অধ্যায়ে বর্ণিত ঘটনাগুলি হইয়া গিয়াছে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

কৃত্তিবাস সকালে কলিকাতার বাসায় বসিয়া আছেন, একখানি বাঙ্গলা সংবাদপত্র পড়িতেছেন। কলিকাতার সংবাদস্তম্ভে নিম্নলিখিত সংবাদটী তাঁহার চিত্তাকর্ষণ করিয়াছে:—

"বিগত ১৭ই ফাল্গুন শনিবার রাত্রিকালে * * গলির বিনোদিনী নাম্নী এক বারবনিতার গৃহে চুরি হইয়া গিয়াছে। ভদ্রবেশধারী চোর বেশ্যাকে নৃত্য-গীতে প্রবৃত্ত করাইয়া, কৌশলে মাদকদ্রব্য মিশ্রিত মদ্য পান করাইয়াছিল। মদ্যপানের কিয়ৎক্ষণ পরে অভাগিনী অজ্ঞান হইয়া পড়ে; দুষ্ট সেই সুযোগে তাহার বাক্স ভাঙ্গিয়া, কয়েক কেতা করেন্সি নোট, এবং কয়েকখানি বহুমূল্য অলঙ্কার লইয়া অদৃশ্য হয়। পরদিবস পুলিসের অনুসন্ধানে প্রকাশ হয় যে, চুরির রাত্রিতে উক্ত বেশ্যালয়ের সম্মুখস্থ পানের দোকানে ভদ্রবেশধারী একজন লোক * * * *।" এমন সময় 'বাবু চিঠি আছে' বলিয়া হরকরা কৃত্তিবাসের নামে একখানি পত্র দিয়া গেল। সংবাদটী অর্দ্ধপঠিত অবস্থায় ফেলিয়া রাখিয়া, কৃত্তিবাস তাড়াতাড়ি পত্রখানি খুলিয়া পড়িলেন।

পত্র লিখিয়াছিলেন কৃত্তিবাসের স্ত্রী। কৃত্তিবাসের গৃহ হইতে একটী স্ত্রীলোক সম্প্রতি বিজয়ার তত্ত্ব লইয়া গিয়াছিল; সে ফিরিয়া আসিয়া বিজয়ার নিপীড়নের কথা কৃত্তিবাসের স্ত্রীকে বলে। তিনি অদ্য অতিশয় দুঃখভরে সেই দুঃসংবাদ

স্বামীকে লিখিয়াছেন। সংবাদ আর কোন উপায়ে কৃত্তিবাসের কর্ণগোচর হইবার সম্ভাবনা ছিল না।

পত্রপাঠ করিয়া কৃত্তিবাসের হৃদয় যেন বজ্রাহত হইল, দেহ থর থর কাঁপিতে লাগিল। অভাগিনী ভগিনীকে পাষণ্ড ভবেশ অবশেষে পদাঘাতে অপমানিত করিয়াছে! ক্রোধে এবং ঘৃণায় কৃত্তিবাস শত বৃশ্চিক দংশনের যাতনা অনুভব করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে হইল, যদি সেই মুহূর্ত্তে দুর্ব্বৃত্তকে নিকটে পান, তবে খণ্ড খণ্ড করিয়া ক্রোধানলে আহুতি প্রদান করেন। পত্রখানি লইয়া কৃত্তিবাস স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ পূর্ব্বক অর্গল বন্ধ করিলেন, এবং শয্যায় শুইয়া পাষণ্ড ভবেশের অত্যাচারের কথা আনুপূর্ব্বিক ভাবিতে লাগিলেন। বিবাহের পর হইতে স্নেহের ভগিনী এতাবৎ-কাল যেরূপে লাঞ্ছিত, মর্ম্মপীড়িত, অত্যাচারিত হইয়াছে, সেই সকল কথা তাঁহার মানসপটে চিত্রের ন্যায় প্রতিবিম্বিত হইয়া উঠিল। কৃত্তিবাস কখন বা ক্রোধে অধীর হইয়া, শয্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিলেন, কখন বা অসহ্য যন্ত্রণায় শয্যা হইতে উঠিয়া, গৃহমধ্যে কুপিত ব্যাঘ্রের ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ক্রমে মনের আবেগ একটু উপশমিত হইলে, সোদরা-বৎসল কৃত্তিবাস নেত্রনীরে ভাসমান হইলেন। ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস প্রবাহিত হইয়া, তাঁহার মনোবেদনার কথঞ্চিৎ উপশম করিল। কৃত্তিবাস ভাবিতে লাগিলেন, 'এক্ষণে কর্ত্তব্য কি? দুর্ব্বৃত্ত চিরজীবনের মত বিজয়া ও তাহার পুত্র কন্যাকে ত্যাগ করিয়াছে; আর কোন্ আশায় তাহারা ভবেশের গৃহে থাকিবে? হায় হায়! পিতা কি

সর্ব্বনাশই করিয়াছেন! অলীক কুল-মর্য্যাদার খাতিরে মেয়েটীকে পথের ভিখারিণী করিয়া গিয়াছেন! যাহা হউক, অবিলম্বে বিজয়াদের পলাসপুরে লইয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত করি। অভাগিনী জন্মের মত সুখ হারাইয়াছে! এক্ষণে যাহাতে জীবনের শেষ কটাদিন শান্তিতে কাটাইতে পারে, তাহার বিধান করা যাউক।

কৃত্তিবাস উঠিলেন। হরিচরণের বাসার সম্মুখস্থ রাস্তায় উপস্থিত হইয়া, একজন লোকদ্বারা হরিচরণকে সংবাদ পাঠাইলেন। হরিচরণ আসিলে, কৃত্তিবাস তাঁহার হস্তধারণ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ বাষ্পাকুল নয়নে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হরিচরণ বুঝিলেন, কৃত্তিবাস তাঁহার ভগিনীর অপমানের কথা শুনিয়াছেন; তাঁহার মন ঈষৎ চঞ্চল হইল। তিনি কৃত্তিবাসকে বলিলেন—"কৃত্তিবাস বাবু, আপনি, বোধ হয়, সকল ঘটনা শুনিয়াছেন। যাহা হউক, সবই ভগবানের ইচ্ছা; আপনি এত উতলা কেন হইতেছেন? যদি আপনার ভগিনীর কপালে দুঃখভোগই লেখা থাকে, কিছুতেই তাহার খণ্ডন হইবে না। আর যদি এ দুঃখভোগ ক্ষণস্থায়ী হয়, তবে অবশ্যই ভবেশের চরিত্র-সংশোধন হইবে। মানুষের সুখ দুঃখের নিয়ন্তা ভগবান্। পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলের উপর ইহজন্মে সুখ বা দুঃখভোগ নির্ভর করে। আপনি স্থির হউন, আমার বাসায় আসুন। দুইজনে বসিয়া এক্ষণে যাহা কর্ত্তব্য, যেরূপ করিলে সকল দিক বজায় থাকে, তাহা স্থির করা যাইবে।" কৃত্তিবাস চক্ষু মুছিয়া দৃঢ়ভাবে উত্তর দিলেন—"ক্ষমা করিবেন, সে দুর্ব্বৃত্ত যে বাটীতে বাস করে,

আমি তাহার ছায়াস্পর্শও করিব না! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার বাসায় আসিলে বাধিত হইব।" হরিচরণ বিষাদমাখা হাস্য করিয়া বলিলেন—"ভাই, ভবেশ কি আর এক্ষণে বাসায় থাকে? শুনিতে পাই, দুই তিন দিন অন্তর একবার আসে, অল্পক্ষণ থাকিয়া আবার অদৃশ্য হয়;—কোথায় থাকে, কোথায় খায়, তা সেই জানে। তাহার সমস্তই রহস্যময় হইয়াছে। আমাদের সহিত দেখা করিতে সে নারাজ; দেখা হইলেও ভাল করিয়া কথা কয় না। ভাবে বোধ হয়, মদ্যপানে তাহার আসক্তি উত্তরোত্তর বাড়িতেছে। আপনি ঘরের ভিতর আসুন, অনেক কথা আছে।"

হরিচরণ ও কৃত্তিবাস গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন। উভয়ের অনেক কথাবার্ত্তা হইল। কৃত্তিবাস, বিজয়া ও তাঁহার পুত্র কন্যাকে নিজগৃহে লইয়া যাওয়ার প্রস্তাব করিলেন। হরিচরণ বলিলেন,—"ভবেশের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে ওঁদের আপনার বাড়ীতে লইয়া যাওয়া ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। ভবেশ যে অতঃপর সংসারের ভার বহন করিবে, তাহা আমার বোধ হয় না। তবে খুড়ীমা প্রাচীনা হইয়াছেন, এ বিষয়ে তাঁহার মত লওয়া প্রথম কর্ত্তব্য। আমার মতে আরও কিছুদিন যাউক। আপনি ইতিমধ্যে একবার খুড়ীমা ও আপনার ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কথাটা উত্থাপন করুন। এদিকে আমি ভবেশের মনোগতভাব স্পষ্টরূপে জানিতে চেষ্টা করি।"

কৃত্তিবাস এ প্রস্তাবে সম্মত হইলেন।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

"কৈ আমার ভবেশ এল না! মৃত্যুকালে বাছার আমার মুখখানি দেখ্‌তে পেলাম না! হা ভগবান!" রুগ্নশয্যায় শায়িতা ভবেশের-মাতা কাতরকণ্ঠে এই কয়টী কথা উচ্চারণ করিলেন।

সান্ধ্যছায়া মেদিনী ছাইয়াছে। সেই ছায়া যেন ভবেশের গৃহে গাঢ়তর কালিমা ঢালিয়া দিয়াছে। গৃহমধ্যে মিটি মিটি দীপ জ্বলিতেছে। মেঝের উপর একটী মলিন শয্যায় ভবেশের মাতা শায়িতা। বৃদ্ধার শোকজর্জ্জরিত দেহখানি রোগের প্রবল আক্রমণে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। বাঁচিবার আশা অল্পই। শয্যাপার্শ্বে বিজয়া, মনোরমা ও বিমল ম্রিয়মান ভাবে বসিয়া পীড়িতার শুশ্রূষা করিতেছেন।

সূর্য্যদেব সমস্ত দিন প্রখর কিরণজাল বর্ষণ করিয়াছেন। ঘন ঘন জলপান করিয়াও প্রাণীগণের পিপাসা মিটিতেছে না। তাহাতে আবার আজ একাদশী! কি দৈবদুর্ব্বিপাক! এহেন দিনে মৃত্যুশয্যায় শায়িতা তৃষ্ণাতুরা বিধবাকে জলগণ্ডুষদানও মহাপাপ! কোন্ হিন্দুরমণী সাহস করিয়া বৃদ্ধার তৃষিত জিহ্বায় এক বিন্দু জল দিবে? শাস্ত্রে যে তাহার নরকে স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছে! বিজয়া ও মনোরমা অশ্রুপূর্ণ নেত্রে বৃদ্ধার বদনে পিপাসার দুঃসহ যাতনা দেখিতে লাগিলেন; তাঁহার আর্ত্তশব্দে করুণাময়ীদের হৃদয়ে তীক্ষ্ণ ছুরিকা বিদ্ধ হইতে লাগিল; কিন্তু কি করিবেন! শাস্ত্রের নিষ্ঠুর আদেশে,

নির্ম্মম দেশাচারে, তাঁহাদের করুণার পূর্ণ উৎস আজ শুষ্ক করিয়াছে। বিজয়া মনের স্থৈর্য্য এককালে হারাইয়াছিলেন।

মনোরমা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন, "দিদি, আর ত এ কষ্ট চখের উপর দেখতে পারি না! ওঃ, কি যাতনা! শেষে কি এক ফোঁটা জল বিনা খুড়ীমার জীবনটা যাবে! না, তা কখনই হতে পারে না! হ'ক আমার নরকে বাস, তা'তেও মনের শান্তি থাকবে; কিন্তু পৃথিবীতে বেঁচে থেকে তার চাইতে সহস্রগুণ নরকযন্ত্রণা ভোগ ক'রতে পারব না! খুড়ীমার মুখে একটু গঙ্গাজল দিই।" বিজয়া ইঙ্গিতে সম্মতি জানাইলেন, তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

মনোরমা গৃহান্তর হইতে একটু গঙ্গাজল লইয়া আসিয়া বৃদ্ধার পার্শ্বে বসিলেন এবং তাঁহার কাণের কাছে অতি স্নেহমাখা বচনে বলিলেন "খুড়ীমা, আপনার বড় তৃষ্ণা পেয়েচে, একটু গঙ্গাজল মুখে দিই, গলাটা ভিজুগ। এতে কোন পাপ নাই।" রোগী বড় ক্লান্ত হইয়াছিলেন, মস্তক নাড়িয়া জলপানে অসম্মতি জানাইলেন। বিজয়া বসনাগ্রে চক্ষু মুছিয়া রোগীর উষ্ণগাত্রে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "মা, একটু গঙ্গাজল খান, কোন দোষ হ'বে না, আমি হাতে করে দিচ্চি।" সে কাতর অনুরোধ হতাশপ্রাণের ব্যাকুলতাময়। বিমল কাঁদিতে কাঁদিতে অধীরা হইয়া বলিল "ঠাকুমা, একটু জল খাও!" হায়, বৃদ্ধার সম্পূর্ণ জ্ঞান ছিল; তিনি স্নেহময়ীদের মুখের দিকে একবার ক্ষীণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলেন "না, দিও না!" কিন্তু বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল!

বৃদ্ধা মনোরমার দিকে চাহিয়া কষ্টে জিজ্ঞাসা করিলেন "মা, ভবেশ এল না?" মনোরমা বলিলেন "তিনি আ'স্বেন বৈকি; টেলিগ্রাফ করা হয়েচে; রাত্রেই এসে পৌ'ছবেন।" রোগীর মুখের ভাবে বোধ হইল, যেন এসংবাদে কতকটা আশ্বস্ত হইয়াছেন। তিনি পুনরপি জড়িতস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন "হরি কৈ?" মনোরমা উত্তর দিলেন "তিনি ভাসুরকে টেলিগ্রাফ ক'রতে গিয়েচেন, এখুনি ফিরে আসবেন।" মনোরমার কথা শেষ হওয়ার অল্পক্ষণ পরেই বাহিরে পদশব্দ শ্রুত হইল। বিজয়া ও মনোরমা অবগুণ্ঠন ঈষৎ টানিয়া দিলেন। হরিচরণ গৃহে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত এবং মুখমণ্ডলে শ্রান্তির চিহ্ন।

হরিচরণ এবার চারিদিনের ছুটীতে বাড়ী আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার খুড়ীমা সান্নিপাতিক-পীড়িতা। বৃদ্ধা তিনদিনের জ্বরেই শয্যাশায়িনী হইয়াছিলেন। এত সত্বর যে পীড়া কঠিন হইবে, তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই; সুতরাং কলিকাতায় হরিচরণ কিম্বা ভবেশের কাছে সময়মত সংবাদ দেওয়ার সুযোগ হয় নাই। সৌভাগ্যবশতঃ হরিচরণ আপনা হইতেই বাড়ী আসিয়াছিলেন, নতুবা বিজয়ার বিপদের পরিসীমা থাকিত না। তিনি চিকিৎসকের কাছে শুনিলেন যে, পীড়া বড় সহজ নহে। যাহা হউক, ভবেশের যাহা কর্ত্তব্য, হরিচরণ তাহার সমুদয় করিলেন। তিনি স্বয়ং ভবেশকে এই পীড়ার সংবাদ টেলিগ্রাফ করিয়া এইমাত্র ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার একমাত্র দুঃখ আজ একাদশী। অদ্য খুড়ীমার প্রাণরক্ষা হইলে, কল্য হইতে যথাবিহিত চিকিৎসা চলিবে।

হরিচরণ শয্যাপার্শ্বে বসিয়া মৃদুস্বরে বলিলেন "খু ভবেশদাদাকে টেলিগ্রাফ ক'রে এলাম; সে বোধ হয়, আজ রাত্রেই এসে পৌঁছবে।" বৃদ্ধা শুনিলেন মাত্র, তাঁহার শুষ্ক জিহ্বা একটী কথাও উচ্চারণ করিতে পারিল না। বিজয়ার উৎসাহের জন্য হরিচরণ বলিলেন, "আজ রাত্রিটা পিপাসার হাত থেকে নিস্তার পেলে আর কোন ভয় নাই।" বিজয়া হতাশের নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক বলিলেন, "রাত্তির কি যাবে ?"

হরিচরণের মাতা ধীরেনকে সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহাদের গৃহে লইয়া গিয়াছিলেন, এবং তাহাকে কোন রূপে খেলায় ভুলাইয়া, খাওয়াইয়া, খগেনের পার্শ্বে নিদ্রিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে হরিচরণ মনোরমাকে বলিলেন,—"তুমি বিমল ও বৌকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাও। বিমল খেয়ে সেইখানেই শুন্; তোমরা খাওয়া দাওয়া করে এস। ততক্ষণ আমি খুড়ীমার কাছে বসচি।" হরিচরণ ঘরের জানালাগুলি খুলিয়া দিলেন এবং রোগীর কাছে উপবেশন করিয়া ব্যজন করিতে লাগিলেন। বিজয়া আহারে একান্ত অনিচ্ছা প্রকাশ করিলেন, কিন্তু মনোরমা অনেক বুঝাইয়া তাঁহাকে ও বিমলকে লইয়া গেলেন।

*   *   *   *

রাত্রি ১২টা বাজিয়াছে। পীড়িতার শয্যাপার্শ্বে হরিচরণের মাতা, মনোরমা ও বিজয়া উপবিষ্টা। কেহ ব্যজন করিতেছেন, কেহ বক্ষে, কেহ হস্তপদে হাত বুলাইতেছেন; কিন্তু তৃষ্ণার যন্ত্রণা উত্তরোত্তর বাড়িয়া এক্ষণে ভীষণ কষ্টদায়ক হইয়াছে।

বৃদ্ধার জিহ্বা কঠিন, শুষ্ক এবং আড়ষ্ট, চক্ষুদ্বয় রক্তবর্ণ ও কোটরলগ্ন, দেখিতে ভয়ঙ্কর; বাক্‌শক্তি পূর্ব্বেই লোপ হইয়াছে। এরূপে জীবন আর অধিকক্ষণ দেহে থাকিতে পারে না। শীতল জল তাঁহার মস্তকে, বক্ষে এবং চক্ষুতে সিঞ্চন করা হইতেছিল, কিন্তু তাহাতে ক্ষণিক শান্তি হইতেছিল মাত্র। হরিচরণ এই সকল দেখিয়া গৃহে শয়ন করিতে যান নাই; আহারাদি করিয়া আসিয়া ভবেশের গৃহেই অবস্থান করিতে-ছিলেন। বিজয়ার এই বিপদে তিনি অধিকতর বিপন্ন হইয়াছিলেন। রোগীর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল দেখিয়া, হরিচরণ ডাক্তার ডাকিতে গিয়াছেন।

রাত্রি ১টার সময় হরিচরণ চিকিৎসককে লইয়া ফিরিলেন। রোগী তখন একবারে সংজ্ঞাশূন্য ও নিমীলিত-নেত্র। ডাক্তার নাড়ী দেখিলেন। হরিচরণের সহিত পার্শ্ববর্ত্তী ঘরে উঠিয়া গিয়া বলিলেন "হরিবাবু, নাড়ী অতি ক্ষীণ দেখিলাম! মৃত্যুর আর বড় বিলম্ব নাই। আমার বোধ হয়, একটু ঠাণ্ডা জল পান করিতে দিলে, আরও পাঁচ ছয় ঘণ্টাকাল জীবন থাকিতে পারে; কিন্তু জীবনীশক্তি আদৌ নাই! এ ক্ষেত্রে যাহা ভাল বিবেচনা হয় করুন!" ডাক্তার চলিয়া গেলেন।

হরিচরণ বিষণ্ণবদনে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিলেন। মাতা, মনোরমা ও বিজয়া উৎসুক ভাবে তাঁহার মুখপানে চাহিলেন। সকলেই বুঝিলেন, চিকিৎসক আশা ত্যাগ করিয়াছেন। হরিচরণ বলিলেন "মা, একটু গঙ্গাজল আন।" মাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, "গঙ্গাজল কি হ'বে বাবা? ডাক্তার কি ব'লে গেলেন? বাঁচার আশা আছে ত?" ডাক্তার যাহা

বলিয়াছেন; হরিচরণ তাহা প্রকাশ করিয়া বলিলেন "মা, এ অবস্থায় যদি খুড়ীমার প্রাণত্যাগ হয়, তা'হ'লে ওঁর মৃত্যুর জন্য আমরা ঈশ্বরের কাছে দায়ী হ'ব। শাস্ত্রের আদেশ শিরোধার্য্য; কিন্তু শাস্ত্রেই বলিয়াছে, জীবনরক্ষা সর্ব্ব-প্রধান ধর্ম্ম। একাদশীর দিন বিধবার মুখে জল দেওয়া যেমন একদিকে পাপ, তেমনি আবার জল না দেওয়ার জন্য একজন মানুষের প্রাণ বিয়োগ হইলে, অধিকতর ভয়ঙ্কর পাপ! সুতরাং অল্প পাপটা লওয়াই শ্রেয়ঃ। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, খুড়ীমার মুখে একটু গঙ্গাজল দিলে কোন দোষই হ'বে না। সকাল পর্য্যন্ত যদি প্রাণটা থাকে, তবে ভবেশের সঙ্গে দেখা হ'লেও হ'তে পারে। কি বল মা, একটু গঙ্গাজল দিই?"

হরিচরণের মাতা চক্ষু মুছিয়া বলিলেন "দাও বাবা, দিদির মুখে একটু গঙ্গাজল দাও। শাস্ত্রের চক্ষে যে এ জলদানে পাপ নাই, তা আমরা বুঝি। শাস্ত্র সনাতন, তাহার বিধান মঙ্গলময়; এমন শাস্ত্র কখন নিষ্ঠুর হ'তে পারে না। দেশাচারই যত অনর্থের মূল! দাও বাবা, গঙ্গা-জল দাও!" বিজয়া আছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

হরিচরণ মাতার হস্ত হইতে গঙ্গাজলের পাত্রটী লইয়া, ফোঁটা ফোঁটা জল বৃদ্ধার ওষ্ঠে দিতে লাগিলেন। জলবিন্দু-গুলি শুষ্ক জিহ্বা সংস্পর্শ করিবামাত্র রোগীর ওষ্ঠ ঈষৎ স্পন্দিত হইল। বিন্দু বিন্দু জল মৃত-সঞ্জীবনী সুধার ন্যায় ধীরে ধীরে সেই চেতনা-হীন দেহে জীবন সঞ্চার করিল;—বৃদ্ধা চক্ষু মেলিয়া চাহিলেন। হরিচরণের মাতা সেই উত্তপ্ত

শীর্ণ দেহে ধীরে ধীরে হাত বুলাইতে লাগিলেন। বিজয়া বাহিরে বারাণ্ডায় পড়িয়া রোদন করিতেছিলেন; মনোরমা তাঁহাকে রোগীর চৈতন্য হওয়ার সংবাদে আশ্বস্ত করিয়া গৃহমধ্যে আনিলেন।

চৈতন্য হওয়ার পর রোগী আর জলপান করিলেন না। হরিচরণও তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া বিরত হইলেন। প্রায় অর্দ্ধ-ঘটিকা পরে, সকলের নৈরাশ-তাপিত অন্তরে আশা জন্মাইয়া, ভবেশের মাতা অস্ফুটস্বরে ডাকিলেন, "ভবেশ!"

হরিচরণ বলিলেন, "ভবেশ একটু পরেই আস্‌বে; খুড়ীমা একটু গঙ্গাজল খাও।"

রোগী জড়িতস্বরে উত্তর দিলেন, "না"।

হরিচরণের মাতা স্নেহভরে ডাকিলেন "ভব, চেয়ে দেখ বোন। আমাদের চিন্তে পাচ্ছ না?" বিজয়া শ্বশ্রূর শীর্ণ হাতখানি লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে ডাকিলেন "মা, তোমার অভাগিনী মেয়েটীর দিকে একবার চাও!" সে শোকদৃশ্যে পাষাণও দ্রব হইয়া যায়। বৃদ্ধা সকলের মুখপানে একবার চাহিলেন। একটী ক্ষীণ নিশ্বাসের সহিত এক ফোঁটা অশ্রু সে স্নেহ-মমতার প্রতিদান করিল। অহো, সংসার-বন্ধন কি কঠিন! জীবনের প্রতি প্রাণীর কি দুশ্ছেদ্য মায়া! রোগী অল্পক্ষণ পরে পুনরায় সংজ্ঞাশূন্য হইলেন।

বিজয়া এবার নিজহস্তে রোগীর মুখে গঙ্গাজল দিতে লাগিলেন। রোগী পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক জলপান করিলেন। পুনরায় তাঁহার চৈতন্য হইল; সঙ্গে সঙ্গে সকলের মনে আশার সঞ্চার হইল। ভবেশের মাতা ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞাসা

করিলেন, "ভবেশ এল না? বাছা রাগ ক'রে বাড়ী থেকে গেছে!" বৃদ্ধার ক্ষীণ দৃষ্টি মুহূর্ত্তের জন্ত প্রত্যেকের মুখমণ্ডলে অর্পিত হইল। 'বি—বি' বিমলের নাম অর্দ্ধোচ্চারিত হইয়া, তাঁহার জিহ্বাতেই লীন হইয়া গেল। তাহার পর বহুকষ্টে "ভ—বে—"বলিয়া, তিনি অচেতন হইলেন। দেহে আর চেতনা ফিরিল না।

তিনটা, চারিটা, পাঁচটা বাজিয়া গেল, ভবেশ আসিল না। প্রত্যুষে ছয়টার সময় সকলকে কাঁদাইয়া, স্নেহময়ী ভবেশের জননী ইহলোক ত্যাগ করিলেন। সংসারের অনেক দুঃখ, অনেক শোক, অনেক মনস্তাপ, সেই সঙ্গে কালের অনন্তগর্ভে মিলাইল। বিজয়া অকুল-পাথারে পড়িলেন,— চারিদিক অন্ধকার দেখিতে লাগিলেন। মৃতার পদযুগল ধরিয়া তিনি আর্ত্তস্বরে কাঁদিলেন "মা, তুমি সকল যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পেলে, আমার যন্ত্রণার শেষ কবে হবে মা!" মনোরমা বিজয়াকে প্রবোধ দিবেন কি, নিজেই কাঁদিয়া অধীরা হইলেন।

বলা বাহুল্য, হরিচরণ যথাবিহিত মৃতার সৎকার করিলেন। বিজয়া অশৌচ গ্রহণ করিলেন। হরিচরণ তাঁহাকে যথাসাধ্য অর্থ সাহায্য করিয়া, কৃত্তিবাসকে সকল সংবাদ লিখিলেন। ভবেশ আসিল না দেখিয়া, তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, পাষণ্ড পুত্রের পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মত।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

পাঠক, আসুন একবার ভবেশের সন্ধান লই। ভবেশ পাষণ্ড, নরাধম, ঘোর অত্যাচারী। কেহ কেহ বলিবেন সে মাতৃহন্তা! অনেকেই হয়ত দুর্ব্বৃত্তের পাপজীবনী শুনিতে কুণ্ঠিত হইবেন। হইবারই কথা। কিন্তু তাহার কার্য্যের বিচারক ভগবান, আমরা কেবল ফলাফলের দর্শক মাত্র। আমরা সংযত মনে তাহার কার্য্যকলাপ পর্য্যালোচনা করিব।

রবিবার সন্ধ্যার সময় হরিচরণের টেলিগ্রাফ কলিকাতার বাসায় পৌছিল, কিন্তু ভবেশ তখন বাসায় ছিল না। সোমবার প্রত্যূষে ভবেশের মাতার মৃত্যু হইল। মঙ্গলবার প্রাতঃকালে ভবেশ বাসায় আসিয়া দুইখানি টেলিগ্রাফ পাইল,—একখানিতে মাতার উৎকট পীড়ার সংবাদ, অপর খানিতে মৃত্যুসংবাদ। মাতার আকস্মিক মৃতুসংবাদে সে প্রথমতঃ বিস্মিত, পরে অন্যমনা, অতঃপর বিমর্ষ হইল। মানব যতই অধঃপতিত হউক না কেন, তাহার হৃদয়ের কতকগুলি বৃত্তি এককালে বিধ্বস্ত হয় না। মনুষ্য কুক্রিয়ায় অত্যাসক্ত হইলে দীর্ঘ-কালে সেই সদ্বৃত্তিগুলি ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অপরিস্ফুট ও নিস্তেজ হইয়া যায় মাত্র। ভবেশ ঘোর দুশ্চরিত্র হইলেও আজ মাতার মৃত্যু-সংবাদে ব্যথিত হইল। সে গৃহ অর্গলবদ্ধ করিয়া বিমর্ষবদনে শয়ন করিল, এবং মাতৃ-স্নেহের কথা ভাবিতে ভাবিতে দীর্ঘনিশ্বাস ও দুইচারি বিন্দু অশ্রু ত্যাগ করিল।

তাহার পর ভবেশ ভাবিতে লাগিল—'কি করি! মার মৃত্যুকালে দেখা কত্তে পা'রলাম না! এখন কোন্ মুখে বাড়ী যাব! কর্ত্তব্য কাজটা এখানে শেষ ক'রলে বোধ হয় চ'লতে পারে। বাড়ী গেলে সামাজিক অনেক কাজ ক'রতে হবে, তার খরচ পত্র চাই।' তখনই ভবেশের মনে হইল, আপাততঃ অশৌচ-চিহ্ন ধারণ, আমিষাদি ত্যাগ এবং একবেলা আতপান্ন ভোজন, এই কয়টী প্রথম কর্ত্তব্য; তাহার পর অশৌচান্তে কেশশ্মশ্রু মুণ্ডন করিতে হইবে। এই চিন্তাগুলিতে সে বিব্রত হইয়া পড়িল। সমস্তদিন তাহার আহার হইল না।

অপরাহ্ণে ভবেশ স্বীয় প্রকোষ্ঠে একাকী উপবিষ্ট। মাতৃশ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণভোজন গ্রামে সম্পন্ন করা সিদ্ধান্ত করিয়া ভবেশ সেই রাত্রেই গৃহগমনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছে। এমন সময় দ্বারদেশে কে আঘাত করিল। ভবেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দ্বার খুলিলে দুইটী যুবাপুরুষ গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

আগন্তুকদ্বয়ের বেশ-পরিপাট্য দেখিলে সম্ভ্রান্তবংশীয় বলিয়া সহজেই বুঝা যাইত। তাহাদের মস্তকে কেশের বিন্যাস অতীব মনোহর। বদন শ্মশ্রুবিরহিত, কিন্তু অর্দ্ধোদ্ভিন্ন গুম্ফে সুশোভিত, এবং দুশ্চরিত্রতা ও লাম্পট্যের চিহ্নে চিহ্নিত। চক্ষু ঢুলু ঢুলু ও গোলাপীবর্ণ। উভয়ের বয়ঃক্রম ছাব্বিশ বা সাতাইশ বৎসরের অনধিক।

আগন্তুকদ্বয়ের একজন বলিল,—"কিরে ভবা, একা বসে ভাবচিস্ কি বল্ দেখি? তোর আবার কি হল! আজ সকাল সকাল যাবার কথা; সন্ধ্যা হতে চল্লো, তবু তোর দেখা নাই। ব্যাপারটা কি?"

ভবেশ বলিল—"ভাই, আজ বড় দুঃসংবাদ পেলাম। কাল মার মৃত্যু হয়েচে। আমাকে আজ রাত্রেই বাড়ী যেতে হবে।"

আগন্তুকদ্বয় ঈষৎ চমকিত হইয়া পরস্পরের মুখপানে চাহিল। যেন এই সংবাদ তাহাদের মনের কি একটা উৎসাহে বিঘ্ন প্রদান করিল।

প্রশ্নকারী—"বটে, তোর মার মৃত্যু হয়েচে? তা তিনি প্রাচীন হ'য়েছিলেন, দুঃখ ক'রবার কোন কারণ নাই। কি ব্যারাম হ'য়েছিল?"

ভবেশ—"জ্বর বিকার। সে দিন আবার একাদশী! বোধ হয়, বড় কষ্টে মার প্রাণটা বেরিয়েচে।"

দ্বিতীয় আগন্তুক—"আরে একাদশীতেই যত বিধবার মরণ! প্রাণান্তেও কি এক ফোঁটা জল খাবে না। আমাদের বাড়ীতে এক বুড়ী একাদশীর দিন মারা গেল। বুড়ী নিজেও ভুগলে, আর বাড়ী শুদ্ধ লোককে জ্বালাতন করলে। একটু জল খেলে মাগী সে যাত্রা বাঁ'চত, কিন্তু কিছুতেই তা খেলে না।"

প্রথম আগন্তুক—"যাক্, যা হবার তা হয়ে গিয়েচে, ভেবে কেবল শরীর খারাপ করা বইত নয়। মনটা যাতে ভাল থাকে তাই কর্।"

ভবেশ—"ভাই, অনেক কথা ভাবচি। প্রথমতঃ আজ দুদিন হল মার মৃত্যু হয়েছে, এখনও আটদিন অশৌচ। অশৌচান্তে কামান, তার পর শ্রাদ্ধ। এসকল কর্ত্তব্য বটে, কিন্তু শ্রাদ্ধটা অনেক টাকার কাজ। বাড়ী যাওয়া একরকম স্থির করিচি। বাড়ী গেলে কিন্তু অনেক হাঙ্গামে প'ড়তে হবে, তাই ভাবচি। না গেলে নিন্দা ও লোকলজ্জা।

তোরা ভাই এসেছিস, ভালই হয়েচে; এ অবস্থায় কি করা উচিত বল্।”

আগন্তুকদ্বয় সমস্বরে বিস্ময় ও বিরক্তি প্রকাশ করিল। প্রথম আগন্তুক বলিল—“ভবেশ, আমি আশ্চর্য্য হ’লাম যে, তুই এই সামান্য বিষয়টা নিয়ে এখনও ভাবচিস্! মজলিসে তুই সর্দ্দার ইয়ার; তোরই বুদ্ধিতে আমরা নিত্য নূতন আমোদ ভোগ করি। ব’লতে্ কি, তোকে ছেড়ে আমরা এক পা-ও চ’লতে পারি না। কিন্তু আজ তোর এ সব বৃথা ভাবনা কেন হ’ল, বু’ঝতে পারচি না। ‘নিন্দা ও লোকলজ্জা!’ হাঃ, হাঃ,* (বিকট হাস্য)—সে ভয় কি আজও করিস্ নাকি ভাই? তবে ত দেখচি, তুই নেহাত বদ্‌রসিক।”

ভবেশ ঘোর অপ্রতিভ হইল। তাহার মুখ রক্তবর্ণ ধারণ করিল। সে উত্তর দিল—“না, আমি তা’ বলিনি; আমি বল্‌চি কি, আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজে এ সব বিষয়ে যেটা আদেশ করে, তা কেমন করে অবজ্ঞা করি?”

প্রথম আগন্তুক—“ধর্ম্ম ও সমাজে কি না আদেশ করে? কিন্তু সে সব মেনে চ’লতে গেলে, চোখ কাণ বুজে থা’কতে হয়;—তা’হ’লে সন্ন্যাসী হ’য়ে সংসারের মায়াটা কাটান দরকার। কিন্তু তা’ ক’রলে আর আমরা বাঁচি কি ক’রে বাবা! এমন সখের জীবনটাকে কি একদম উল্‌টে ফেলতে বল!”

ভবেশ—“না, তবে কি জান, এসব—”

প্রথম আগন্তুক—“আমার কথাটা শোন ভাই। মাতৃদায়ে শাস্ত্রের যে বিধান, তা কি পালন করা তোমার আমার

কাজ? সে কেবল অনর্থক কষ্টভোগ, আর মিছামিছি খরচ পত্র। আমার বিশ্বাস, এসব বিষয়ে খরচ করা কেবল টাকা জলে ফেলে দেওয়া। তা'র ওপর আবার মাথার চুল, গোঁপ, দাড়ি কামিয়ে একটা কিম্ভূত-কিমাকার সাজা! কি সর্ব্বনাশ, তুই কি সত্যি সত্যি এসব করবি ভাবচিস্ নাকি? (আগন্তুক-দ্বয়ের উচ্চহাস্য)। তা'র পর সেই মোহনবেশে * * দের কাছে দেখা দেবে? বাবা, তোমার সে চেহারায় ওরা ঘুরে না পড়ে! আমার ত তাই মনে হয়ে হাসিতে পেট ফেটে যাচ্চে।" উভয়ে হাসিয়া লুটিপুটি! গভীর বিষয়টী শেষে লম্পটদিগের উপহাসে পরিণত হইল।

ভবেশের দুর্ব্বল ও ক্ষুদ্র হৃদয় অভিভূত করিতে, এতদপেক্ষা প্রবল যুক্তি প্রয়োগের আবশ্যকতা ছিল না। সে মনে করিল—'কথাটা মন্দ বলে নাই। বরং খরচপত্র ক'রে শ্রাদ্ধ-শান্তি একদিনে ফুরিয়ে যাবে; কিন্তু গোঁপ দাড়ি ফেলে, কিছুকালের মত সঙ্ সেজে থাকা ত পোষাবে না। মজলিসে কি ক'রে মুখ দেখাব?' প্রকাশ্যে বলিল—"হরেন, তা'ত ভাই সব বু'ঝলাম, এখন উপায় কি?"

দ্বিতীয় আগন্তুক—"উপায় আমি ঠিক করিচি। তোকে এখন কিছুদিন গা ঢাকা হ'য়ে থা'কতে হবে।"

প্রথম আগন্তুক—"ঠিক বলিচিস নরেন! ভবেশ, আমার বাড়ী চল্; সেইখানে থাকবি। কিছুদিন পরে সব গোলযোগ মিটে যাবে। ওঠ ভাই, সন্ধ্যা হ'য়ে এল। আজকার মজলিসটে যেন বন্ধ না হয়! সব ঠিক্; গোটা তুই নূতন * আস্‌বে; এখন তুই আমাদের প্রধান ভরসা। দেখিস ভাই,

যেন আমাদের ভরপূর আমোদে বাধা না পড়ে! একটু টানলেই তোর মেজাজটা ঠিক হ'য়ে যাবে এখন।"

"তবে চল" বলিয়া ভবেশ সম্মতি জানাইল। আগন্তুক-দ্বয়ের প্ররোচনায় সম্মোহিত হইয়া, ভবেশ সেই রজনীতেই পাপ-মজলিসে সোৎসাহে যোগ দিল। তাহার মনে ধর্ম্ম ও নীতিজ্ঞানের যে টুকু উন্মেষ হইয়াছিল, তাহা কুয়াশায় সূর্য্যোদয়ের ন্যায় প্রকাশ হইতে না হইতে মিলাইয়া গেল।

*　　*　　*　　*

হরিচরণ কলিকাতায় আসিয়া শুনিলেন, ভবেশ আজ কয়েকদিন নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তিনি আরও জানিতে পারিলেন যে, ভবেশ যে দিবস প্রাতঃকালে বাসায় আসিয়া মাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইয়াছিল, সেই দিবস সন্ধ্যার সময় দুইটী কুসঙ্গীর সহিত বাসা হইতে গিয়াছে, আর ফিরে নাই। সাধু হরিচরণ ভবেশের এই আচরণে আন্তরিক ব্যথিত হইলেন।

এই ঘটনার এক সপ্তাহ পরে, একদিন প্রভাতে কৃত্তিবাস হরিচরণকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন। হরিচরণ গিয়া দেখিলেন, কৃত্তিবাস শয্যায় শুইয়া রোদন করিতেছেন, তাঁহার পার্শ্বে একখানি পত্র পড়িয়া আছে। কৃত্তিবাস নীরবে সেই পত্র খানি হরিচরণের হাতে দিলেন। পত্রে ধীরেনের মৃত্যু সংবাদ পাঠ করিয়া, হরিচরণ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। তিনি বুঝিলেন, দুর্বৃত্তের পাপানলে নির্দ্দোষ বালক দ্বিতীয় আহুতি হইল। কৃত্তিবাস কাঁদিতে কাঁদিতে অধীর হইয়া বলিলেন—"ভাই, মনে করিয়াছিলাম, বিজয়ের অশৌচ শেষ হইলে, একটা ভাল দিন দেখাইয়া বাড়ী লইয়া যাইব; কিন্তু

একি সর্ব্বনাশ ঘটিল! ওঃ! ভগবন্, নিরাশ্রয়া অবলার এ ভীষণ শাস্তি কি জন্য?"

হরিচরণ চক্ষু মুছিয়া কৃত্তিবাসকে বলিলেন—"ভাই, আর কালবিলম্ব করিবেন না। আপনি স্বয়ং যাইয়া আপনার ভগিনী ও ভাগিনেয়ীকে সান্ত্বনা-বাক্যে স্বগৃহে লইয়া যাউন। ভবেশের পাপাচারের ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে; ইহা অধিকতর বিষময় হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি। ভবেশ নির্ম্মম; তাহাতে সে এক্ষণে ঘোর মাতাল, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, মনুষ্যত্ববিহীন। আপনি আজই রওনা হউন।"

কৃত্তিবাস ব্যস্তসমস্ত হইয়া, সেইদিন রাত্রিযোগেই রওনা হইলেন। তাঁহার মুহুর্মুহুঃ ভয় হইতেছিল, পাছে দুঃসহ শোকভরে অভাগিনী ভগিনী আত্মহত্যা করে।

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

* * বাগানের হরেন্দ্রনাথ রায়, সম্প্রতি পিতৃবিয়োগ হওয়ায় প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। ইঁহার পিতা শিবনাথ রায় সততা, দয়াশীলতা, সরলতা প্রভৃতি সদ্‌গুণে সর্ব্বজন-প্রিয় ছিলেন। তীক্ষ্ণ বিষয়-বুদ্ধি পরিচালনে পিতৃ-পিতামহ-উপার্জ্জিত সম্পত্তি দশগুণ বর্দ্ধিত করিয়া, পরিণত বয়সে রায় মহাশয় পরলোক প্রাপ্ত হন। দয়া দাক্ষিণ্যাদি গুণে সকলের মুখেই তাঁহার প্রশংসা শুনা যাইত, সুতরাং তাঁহার মৃত্যুতে সকলেই আন্তরিক শোক প্রকাশ করিয়াছিল।

এতাদৃশ সৌভাগ্যবান্, ধনী, মানী, যশস্বী ব্যক্তি সংসারে অবিমিশ্র সুখভোগ করিতে পারেন নাই। পুত্র হরেন্দ্রনাথ বাল্যকাল হইতেই উচ্ছৃঙ্খলতার পরিচয় দিয়াছিল। স্নেহবতী মাতা এবং বৃদ্ধা পিতৃস্বসার অবাধ আদরে, হরেন্দ্রের চরিত্র সংগঠনে দুর্লঙ্ঘ্য অন্তরায় হইয়াছিল। হরেন্দ্র যখন যাহা করিব বলিত, কেহ কদাচ সে কার্য্যে তাহাকে বাধা দেয় নাই; সে যে কার্য্যে অনাস্থা প্রদর্শন করিয়াছে, সে কার্য্যে তাহাকে অনুরক্ত করিতে কেহই প্রযত্ন করে নাই। একটী বালকের পক্ষে ইহা যে কতদূর অনিষ্টকর, তাহা সহজেই অনুমেয়। শৈশবে হরেন্দ্রের যে কেবলমাত্র সংশিক্ষার অভাব হইয়াছিল, তাহা নহে। পিতা মাতার ঔদাসীন্যে এবং তাড়না-শৈথিল্যে সুকুমার বয়সেই সে কুসঙ্গে মিশিতে শিখিয়াছিল।

পুত্রের শিক্ষা ও চরিত্র গঠন সম্বন্ধে পিতামাতার যে কি কঠিন দায়িত্ব, তাহা তাঁহারা অনেক সময় বুঝেন না; সুতরাং বহুল অনর্থ সংঘটিত হয়। তাহাব নিদর্শন আমরা পূর্ব্বাপর দেখিয়া আসিতেছি।

বলা বাহুল্য, এই সকল কারণে হরেন্দ্র প্রথম হইতেই লেখা পড়ায় একান্ত বীতশ্রদ্ধ ছিল। একটা বাধাবাঁধি কঠোর শিক্ষা তাহার ভাললাগিবে কেন, বিশেষতঃ পাঠাভ্যাস! শিবনাথ রায় পুত্রের জন্য এক শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। শিক্ষক মহাশয় প্রত্যহই পড়াইতে আসিতেন, কিন্তু ছাত্রের অনুপস্থিতি হেতু প্রায়ই তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইত। পিতার ভর্ৎসনায় হরেন্দ্র কখন কখন শিক্ষকের নিকট

দর্শন দিত। শিক্ষক বিলক্ষণ বুঝিয়াছিলেন যে, হরেন্দ্রের মত ছাত্রের পাঠানুরক্তি-বিধান সাক্ষাৎ বাগ্‌দেবীরও অসাধ্য; তথাপি তিনি সাধ্যমত তাঁহার কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হন নাই। অবশেষে শিক্ষকের উৎপীড়ন হইতে পরিত্রাণ মানসে, হরেন্দ্র মাতার কাছে তাঁহার নামে বিবিধ অভিযোগ উপস্থিত করিতে লাগিল। গুরু-শিষ্যের এবম্বিধ প্রতি-যোগিতা কিছুকাল চলিলে, অবশেষে শিষ্যেরই জয় হইল। ১২ * * সালের বৈশাখমাস বৃহস্পতিবার পূর্ণ ষোড়শ বর্ষ বয়সে, শ্রীমান্ হরেন্দ্রনাথ পাঠে ইস্তফা দিলেন। এইস্থানে ইহা বলিতে লজ্জা হয় যে, সেই সূত্রে বৃদ্ধ শিবনাথ রায় বিশেষরূপে লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন।

রায় মহাশয় স্বাভাবিকই শান্ত-প্রকৃতি, এবং চলিত ভাষায় একটু "স্ত্রৈণ" ছিলেন; (আজকাল কোন্ হৃদয়বান্ ব্যক্তি এ কলঙ্কের হাত এড়াইতে পারিয়াছেন?) সুতরাং উগ্রমূর্ত্তি স্ত্রীকে প্রায়ই আঁটিয়া উঠিতে পারিতেন না। গৃহিণী কোমর বাঁধিয়া চোক রাঙ্গাইয়া সুর ধরিলেন, "বলি হ্যাঁগা, এসব কি শুনতে পাই? কোথাকার একটা ভবঘুরে মাষ্টার ধ'রে এনে তার হাতে ছেলে সমর্পণ করেচ! সে ছেলের আমার নাকালের বাকি কি রেখেচে? গালাগালি, বকুনি, মার, সকল রকম অপমান তার কর্ত্তৃক হয়েছে! তোমাকে ব'লে রাখচি, ফের যদি সে মাষ্টার আমার বাড়ীর ত্রিসীমানায় পা দেয়, তা'হ'লে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে বার ক'রে দেব! এসকল অনর্থের মূল তুমি! ছেলের আমার লেখা পড়ার দরকার নেই!" শিবনাথ নাচার, সেই তুমুল তুফানে

পড়িয়া হতবুদ্ধি হইয়া হাল ছাড়িয়া দিলেন। শিক্ষক তাড়িত হইলেন। হরেন্দ্রের মাতা এ সম্বন্ধে প্রতিবেশিনী কোন রমণী কর্ত্তৃক পৃষ্টা হইলে বলিয়াছিলেন, "ছেলের আমার পড়া শুনা সহ্য হয় না,—শরীর অসুস্থ হয়। তা ষষ্ঠীর অনুগ্রহে বাছা আমার বেঁচে থাক, ঈশ্বরেচ্ছায় ওর লেখাপড়া শেখার কি দরকার। চাকরি ক'রে ত আর খেতে হবেনা?"

প্রশ্নকারিণী "তা না ত আর কি? পেটের দায়ে পড়া শুনা করা বইত আর নয়? হরেন বেঁচে থাক্, কত লেখা পড়া জানা লোক ওর খেয়ে মানুষ হবে।" ইত্যাদি চাটু বচনে তাঁহার কথা সম্পূর্ণ অনুমোদন করিয়াছিলেন।

সরস্বতীর সহিত বিচ্ছেদ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, হরেন্দ্রের লক্ষ্মীর সহিত সদ্ভাব-সংস্থাপনের একটা মন্ত্রণা চলিল। হরেনের জন্মগ্রহণের সমসময়ে পুত্রবধূর মুখ-দর্শন কামনা মায়ের অন্তরে অহরহঃ জাগরূক ছিল, এক্ষণে সেই কামনা পূর্ণ করিবার সম্পূর্ণ সুযোগ ঘটিল। গৃহিণী একদা হরেন্দ্রের পিতাকে বলিলেন "হ্যাঁগা, তোমার বুদ্দিশুদ্দি কি একবারে লোপ পেয়েচে! তিন কাল গিয়েচে, শেষ কালে পড়েচ; উপযুক্ত ছেলের বে দিয়ে পৌত্রের মুখ-দর্শন সাধ কি তোমার নাই? তা তোমার কাণ্ডজ্ঞান থাক, আর নাই থাক, আমি চেষ্টায় রইলাম। ভাল মেয়ে পেলেই হরেণের বে দেব। আমার ছেলের সঙ্গে কতজন মেয়ের বে দিতে আগ্রহ ক'রবে, কতজন পায়ে ধ'রে সাধ্য-সাধনা ক'রবে" ইত্যাদি। শিবনাথ শুনিয়া একটু চটিয়া উত্তর দিলেন, "ছেলের বিবাহে কি আমার অসাধ, কিন্তু ছেলের কি গুণ দেখে লোকে মেয়ে

দিতে আগ্রহ ক'রবে বল দেখি? অল্পবয়সেই লেখা পড়া ছাড়ালে। আবার শুন্‌তে পাই এরই মধ্যে কুসঙ্গী সব জুটেচে। অধঃপাতের আর বাকি কি? তোমরাই ত অযথা আদর দিয়ে ছেলেটার মাথা খেয়েচ! আমি দেখ্‌তে পাচ্চি, বিষয়-ওর হাতে প'ড়লে ছারেখারে যাবে। যা' হ'ক, যদি কোন বিবাহের প্রস্তাব আসে, তবে যা হয় করা যাবে, নইলে নিজে থেকে কোন প্রস্তাব আমি কিছুতেই ক'রব না।" কর্ত্রী পুত্রনিন্দা ও তৎসহ স্বীয় নিন্দাবাদ শ্রবণে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, রায় মহাশয়কে বিলক্ষণ দুই এক কথা শুনাইয়া দিলেন, এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন, সেই মাসের মধ্যেই হরেণের বিবাহ দিবেন।

তাহাই হইল। হরেন্দ্র সুপ্রসিদ্ধ বোস বংশের পরমা-সুন্দরী এক কন্যা বিবাহ করিয়া ঘরে আনিয়া, জননীর হর্ষ বর্দ্ধন করিল। বিবাহে মহা সমারোহ হইয়াছিল। বড় আদরের একমাত্র পুত্রের বিবাহে, হরেণের মাতা মনের সঞ্চিত সাধ এককালে মিটাইয়াছিলেন। কিন্তু রায় মহাশয় পুত্রের বিবাহে কিছুমাত্র আনন্দ-রসাস্বাদ করেন নাই। গৃহিণী তাঁহাকে যেরূপ চালাইলেন, তিনি সেইরূপ চলিলেন। নববধূ হিরণ্ময়ী রূপরাশি ও প্রভূত যৌতুক স্বামীগৃহে ঢালিয়া দিলেন।

তাহার পর দশ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। হরেন্দ্রের মাতা অনেকদিন ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে, পৌত্রের মুখ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই। শিবনাথ রায়ও সম্প্রতি স্বর্গধামে পত্নীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। হরেন্দ্র এক্ষণে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী।

তাহার সংসারে স্ত্রী, বৃদ্ধা পিসি এবং দূর সম্পর্কের কয়েক-জন্ জ্ঞাতি ভিন্ন আর কেহই ছিল না।

শিবনাথ রায়ের ভবিষ্যবাণী এতদিনে সফল হইল। তাঁহার জীবদ্দশায় হরেন্দ্রের সম্পূর্ণ চরিত্রদোষ ঘটিয়াছিল, সুতরাং তিনি বৃদ্ধ বয়সে বড়ই মনস্তাপ পাইয়াছিলেন। হরেন্দ্র পূর্ণ বয়স্ক যুবক; তাড়না ভর্ৎসনার অতীত। রায় মহাশয় এক-মাত্র পুত্রের অধঃপতনের কথা মনে করিয়া, নিভৃতে দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিতেন। এক্ষণে স্বর্গধামে গিয়া, তিনি সকল মনস্তাপ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিয়াছেন।

বিবাহের কিছুকাল পরেই হিরন্ময়ী বুঝিয়াছিলেন, তাঁহার কপালে ভগবান্ দুঃখভোগ লিখিয়াছেন। স্বামীর দুশ্চরিত্রতার কথা তিনি ক্রমে সকলই শুনিলেন, এবং তাহার ব্যবহারে মর্ম্মপীড়া পাইতে লাগিলেন। হিরণ্ময়ী মাঝে মাঝে অকারণে স্বামী কর্তৃক নিগৃহীতা হইতেন। যাহা হউক, শ্বশুর ও শাশুড়ীর জীবদ্দশায় অভাগিনী তাঁহার দুঃখের জীবন ততটা ভারস্বরূপ মনে করেন নাই।

কিন্তু হরেন্দ্র এক্ষণে ঘোর মাতাল এবং দুশ্চরিত্র। তাহার বাল্যকালের কু-চরিত্র সঙ্গীগণ তাহাকে পূর্ণগ্রাস করিয়া বসিয়াছে। দিবারাত্রি সেই দুর্ব্বৃত্তদের সহবাসে হরেন্দ্র কাল-যাপন করে। সে তাহার স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা হারাইয়াছিল, পাশব আমোদ ব্যতিরেকে তাহার আর কিছুই ভাললাগিত না। হিরণ্ময়ীর মাসান্তেও স্বামী সন্দর্শন ঘটিত না।

অভাগিনীর স্বর্ণকান্তি দুঃখে ও ঘৃণায় মলিন হইয়াছে। হরেন্দ্র পরিষদ্বর্গ পরিবৃত হইয়া, প্রকাশ্যেই পাশব আমোদে

রত থাকে। পিতার মৃত্যুতে এই আমোদভোগের একমাত্র অন্তরায় দূরীভূত হইয়াছে। হরেন্দ্রের মনোমত কয়েকটী সঙ্গীও জুটিয়াছে। প্রাসাদ তুল্য ভবনের বহিঃস্থ এক প্রকোষ্ঠে প্রতি রজনী নিয়মিত মজলিস বসিয়া থাকে।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

হরেন্দ্রের স্ত্রী অতি কোপন-স্বভাবা গর্ব্বিতা ও তেজস্বিনী রমণী। পিত্রালয়ে সুখে ও আদরে লালিত পালিত হওয়ায়, তিনি পরাধীনতা আদৌ সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার স্বভাবে মান, দর্প অতি প্রবল। শুনা যায়, বালিকা হিরণ্ময়ী যৎকালে পিত্রালয়ে ছিলেন, তখন কেহ তাঁহার আত্মাভিমানে আঘাত করিলে, কখনই সে ব্যথা ভুলিতেন না। এমন কি, অপরাধকারী বিনীত হইয়া দোষ স্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিলে, তবে তাঁহার অভিমান ও ক্রোধের উপশম হইত। বয়োবৃদ্ধি সহকারে হিরণ্ময়ীর সেই স্বভাব বদ্ধমূল হইয়া, বহুল অনর্থের নিদান হইয়াছিল।

বিবাহ-বন্ধন এতাদৃশ রমণীর পক্ষে বড়ই বিড়ম্বনাজনক হওয়ার সম্ভাবনা। স্বামী চরিত্রবান্, উন্নতমনা এবং ক্ষমাশীল হইলে, হিরণ্ময়ী তুল্য রমণীও সুখের সংসার পাতাইতে পারেন। কিন্তু হিরণ্ময়ীর ভাগ্যে তাহা ঘটে নাই। স্বামীর কুব্যবহার নীরবে সহ্য করিয়া, তাঁহাকে সুপথে আনার চেষ্টা করা, কুপথগামী স্বামীর প্রতি সমান ভক্তিমতী থাকা,

কায়মনোবাক্যে অপদার্থ স্বামীকে দেবতুল্য পূজা করা, তাঁহার মত মান-গর্ব্বিতা রমণীর চরিত্র-সঙ্গত নহে। তিনি জানিতেন, স্বামী তাঁহার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিবেন, সেইরূপ প্রতিদান পাইবেন। স্বামী ভাল ব্যবহার না করিলে, তিনি ফিরিয়াও চাহিবেন না, মুহূর্ত্তের জন্য হীনতা স্বীকার করিবেন না।

হরেন্দ্র উত্তরোত্তর যতই উচ্ছৃঙ্খল হইতে লাগিল, হিরণ্ময়ী ততই তাহার প্রতি অধিকতর বীতশ্রদ্ধ হইতে লাগিলেন। এ বিরাগ কি, পাঠককে তাহার কথঞ্চিৎ আভাস দেওয়া চাই। দুর্ব্বৃত্ত স্বামীর প্রতি এতাদৃশ বিরাগ হিরণ্ময়ীরই হওয়া সম্ভব, বিজয়ার নহে। উভয়ের চরিত্র বিভিন্ন উপাদানে গঠিত। বিজয়া পরমা সাধ্বী, অথচ হিরণ্ময়ীর চরিত্রে বিন্দুমাত্র পাপস্পর্শ হয় নাই। তবে দেখা যাক্, পার্থক্য কোথায়?

বিজয়া ক্ষমা ও ধর্ম্মরূপিণী। তিনি মনে করিতেন যে, মন্দভাগ্য বশতঃ এজন্মে তিনি স্বামীর অনুরাগ ভোগ করিতে পারিলেন না। দুঃখভোগ তাঁহার অদৃষ্টের লিখন, বিধির নির্ব্বন্ধ। তাঁহার বিশ্বাস ছিল, স্বামীর সন্তোষ বিধান স্ত্রীলোকের সর্ব্বান্তঃকরণে করণীয়, এবং তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। স্বামী কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া, বিজয়া বড় দুঃখে জীবন-যাপন করিতেছিলেন; কিন্তু উপাসনা দ্বারা ভর্ত্তার অনুকম্পা ফিরিয়া পাইবেন, এ আশা আজীবন তাঁহার অন্তর্নিহিত ছিল, এবং সেই আশায় তিনি জীবনধারণ করিয়াছিলেন। কাল-রজনী প্রিয়তম-সূর্য্যের সহিত বিজয়া-নলিনীর বিচ্ছেদ সংঘটন করিয়াছিল; কিন্তু তিনি আশায় বুক বাঁধিয়াছিলেন যে,

আবার প্রভাত আসিবে, আবার তরুণ ভাস্কর হাসিতে হাসিতে উদিত হইয়া, প্রেমসুধা বর্ষণ পূর্ব্বক তাহার প্রাণের খেদ মিটাইবে। সেই আকাঙ্ক্ষিত প্রভাতে তাঁহার সকল দুঃখের অবসান হইবে। কিন্তু বিজয়ার ভাগ্যে সে সুপ্রভাত সমাগত হয় নাই। দুঃখ রজনীতেই তাঁহার জীবন পর্য্যবসিত হইয়াছিল।

হিরণ্ময়ী মানিনী। স্বামী যথেচ্ছাচারী হইলে, হিরণ্ময়ী তাঁহার মুখদর্শন করিবেন না। স্বামী সাধু এবং প্রেমিক হইলে, হিরণ্ময়ীর প্রাণের ভালবাসা পাইবেন।

বিজয়ার ন্যায় হিরণ্ময়ী দুর্ব্বৃত্ত স্বামীকে দেব-সদৃশ পরম পূজ্য মনে করেন না। বিজয়া হিন্দুর আদর্শ সতী। হিরণ্ময়ীর সতীত্বে সে আত্ম-বিস্মৃতি-মাখা কোমলতা নাই, তাহা অহংপূর্ণ। এইখানেই পার্থক্য। ক্রুদ্ধ হইলে, হিরণ্ময়ীর অন্তরে দাবাগ্নি জ্বলিত; অভাগিনী সেই বহ্নিতে অল্পে অল্পে দগ্ধ হইতেছিল। হিরণ্ময়ী মনে করিতেন, "আমি কি এতই হীন যে, স্বামী অকারণে আমাকে অবজ্ঞা করিয়া, আমার চক্ষের উপর ব্যভিচার করিবেন, আর আমি নীরবে সহ্য করিয়া, সেই কদাচারী স্বামীর পূজা করিব? এ প্রাণ থাকিতে তাহা হইবে না।"

কিন্তু হইলে কি হয়, বিবাহিতা স্ত্রীলোক বিবিধ বিধানে পরাধীনা। অনেক বিষয়েই তাহাকে স্বামী-মুখাপেক্ষিণী হইতে হয়; সুতরাং স্বাধীন-স্বভাবা ও মানদৃপ্তা হইলে ক্ষোভাগ্নিতে পুড়িয়া মরে। হিরণ্ময়ীর কপালেও তাহাই ঘটিয়াছিল। দুর্ব্বৃত্ত স্বামীর হাতে পড়িয়া, তিনি সুখ-সাধে

জলাঞ্জলি দিয়াছিলেন। হরেন্দ্রকে হিরণ্ময়ী ভয়-মিশ্রিত ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন।

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, স্বামীগৃহে এত অসুখ ভোগ করিয়াও, হিরণ্ময়ী পিতৃগৃহে গেলেন না কি জন্য। এ প্রশ্ন হিরণ্ময়ীর মনেও উদিত হইয়াছিল, এবং মানদর্প তাহার উত্তর দিয়াছিল। হিরণ্ময়ী মনে করিলেন, "এ অবস্থায় পিতৃগৃহে গেলে লোকে কি ভাবিবে? লোকে ভাবিবে যে, আমি স্বামী-কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া, অন্নের জন্য বাপের বাড়ী এসিচি। ছি ছি! কি ঘৃণার কথা! তার চাইতে মরণ শতগুণে শ্রেয়ঃ! কেন বাপের বাড়ী যাব? যতদিন জীবন আছে, এইখানেই থা'কব। তারপর কপালে যা আছে তাই হবে!"

এইরূপে হিরণ্ময়ী কষ্টকর জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। ইদানীং হরেন্দ্রের সহিত তাঁহার একরূপ ছাড়াছাড়ি হইয়াছিল। হরেন্দ্র বড় একটা দেখা করিতে আসিত না; অন্দর মহলে আসিলে মানিনী হিরণ্ময়ী তাহার দৃষ্টিপথ-বহির্ভূত থাকিতেন। যদি কখনও হরেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইত, হিরণ্ময়ী অমনি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যাইতেন।

হিরণ্ময়ীর প্রতি হরেন্দ্রের কিরূপ মনোভাব, পাঠক বুঝুন। সে যে হিরণ্ময়ীকে ভালবাসিত, তাহা কেমন করিয়া বলিব? আর ভাল যে বাসিত না, তাহারও স্পষ্ট কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। বস্তুতঃ যাহা দেখা যাইত, তাহাতে এইটুকু বুঝা যায় যে, হিরণ্ময়ীর প্রতি তাহার কোন একটা বিশেষ মনোভাব ছিলনা। হিরণ্ময়ী, তাহার

স্ত্রী থাকুন আর নাই থাকুন, তিনি ঘরের গৃহিণী ভাবেই থাকুন, বা দাসী ভাবেই থাকুন, হরেন্দ্রের কিছুমাত্র আসিয়া যাইত না। তাহার অবাধ আমোদে বাধা না দিয়া, হিরণ্ময়ী তাহার বিষয় সম্পত্তি একাকিনী উপভোগ করুন, হরেন্দ্রের তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু সে এতাদৃশ ব্যবহারে তেজস্বিনী ফণিনীর শিরে পদাঘাত করিয়াছিল। হরেন্দ্রের স্ত্রীর প্রতি যেমনই মনোভাব হউক না কেন, হিরণ্ময়ী ইদানীং স্বামীকে আন্তরিক ঘৃণা করিতেন, এবং তাঁহার ভক্তির অযোগ্য মনে করিয়া, কাছে আসিতে দিতেন না।

আসল ব্যাপার যাহাই হউক, হিরণ্ময়ী স্বামীগৃহে কর্ত্রী। তিনি বড়মানুষের বউ, সুতরাং চাকর চাকরাণীর অভাব নাই। তাঁহার সকল প্রকার হুকুম তামিল করিতে পরিচারকবৃন্দ তটস্থ। হিরণ্ময়ী কিন্তু তাহাদিগকে দেখিতে পারিতেন না, কারণ তাহারা প্রকৃত প্রস্তাবে হরেন্দ্রেরই লোক। পিতৃগৃহ হইতে রাধানাম্নী এক পরিচারিকা তাঁহার সঙ্গে আসিয়াছিল, সে অধুনা হিরণ্ময়ীর খাস পরিচারিকা। তাঁহার সমস্ত পরামর্শ রাধার সহিত হইত। হরেন্দ্রের উপর ক্রোধ হইলে, হিরণ্ময়ী রাধার কাছে কখন কখন মন খুলিতেন। তৎকালে রাধাকে একমাত্র ব্যথার ব্যথী করিয়া, তাঁহার হৃদয়ের দাবদাহ কিয়ৎপরিমাণে শান্ত করিতেন। রাধা দাসী হইলেও এইরূপ অসহায় কর্ত্রীর প্রিয়সঙ্গিনী রূপে গণ্যা হইয়াছিল। হিরণ্ময়ী রাধাকেই দৌত্য কার্য্যে পাঠাইতেন।

বস্তুতঃ স্বামী-স্ত্রীর এবম্বিধ বিসদৃশ ব্যবহারে, হরেন্দ্রের সংসার অশান্তির আগার হইয়া উঠিয়াছিল। হরেন্দ্র প্রতিদিন

মুক্তহস্তে পিতার অর্জ্জিত অর্থরাশি পাপাচারে ব্যয় করিতেছিল, ভৃত্যেরাও সুযোগ বুঝিয়া নিঃশঙ্কে প্রভুর ধন অপহরণ করিতেছিল। যত্ন-প্রতিষ্ঠিতা লক্ষ্মী তাড়িত হইয়া, শিবনাথের ভবন অবশেষে অলক্ষ্মীর লীলাস্থল হইল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি আটটা বাজিয়াছে। হরেন্দ্রের প্রশস্ত মজলিস-গৃহ বিবিধ আসবাবে সুসজ্জিত। দুইটী সুন্দর ঝাড়ের আলোকে গৃহ আলোকিত হইয়াছে। ঘরের মেঝে সুকোমল গালিচায় ঢাকা, তদুপরি দুগ্ধফেননিভ চাদর বিস্তৃত। সেই মনোরম শয্যার উপর কয়েকটী তাকিয়া যেন ম্রিয়মানভাবে পড়িয়া আছে। তাকিয়াদের জীবন বড়ই দুঃখময়, কেবল ভারবহনই তাহাদের একমাত্র কার্য্য; সুতরাং তাহারা যে সর্ব্বদাই মর্ম্ম-পীড়িত থাকিবে, তাহা বিচিত্র নহে। তবে জানিনা, যখন মলিন আবরণ উন্মোচিত করিয়া শুভ্র ধৌত আবরণে তাহাদের গাত্র শোভিত করা হয়, তখন তাহাদের মনে হর্ষসঞ্চার হয় কি না! আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা এই তাকিয়া শ্রেণীর।

তাকিয়া ছাড়া সেই জাতীয় আরও কয়েকটী দ্রব্য ইতস্ততঃ পড়িয়াছিল। তাকিয়াকে পীড়ন করিলে নমিত হইয়া সহ্য করে; কিন্তু শুনা যায় যে, এই শেষোক্ত জীব পীড়িত হইলে গভীর নির্ঘোষে মর্ম্মবেদনা শুনাইয়া দেয়। এগুলি বাঁয়া, তবলা, পাকোয়াজ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র।

দেওয়াল-সংলগ্ন দুই তিনটী আলমারীতে হুইস্কি, শ্যাম্পেন প্রভৃতির বোতল সুসজ্জিত রহিয়াছে। যে প্রকার মদিরা চাই, তাহাই মিলিবে। যাহা অভিরুচি, প্রাণ ভরিয়া পান কর, কোন বাধা নাই।

আর পাঠক, চাহিয়া দেখুন, চতুঃপার্শ্বে কেমন মনোহর ছবি শ্রেণীবদ্ধ ঝুলিতেছে। সর্ব্বশুদ্ধ ১৪।১৫ খানি হইবে। আসুন, ছবিগুলি ভাল করিয়া দেখা যাউক। না, দেখিয়া কাজ নাই! এ যে কুরুচির লীলাস্থল, অশ্লীলতার রঙ্গভূমি! নয়ন এ দৃশ্য দেখিতে নারাজ।

হরেন্দ্র একটী তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে ফুলদানিতে গুটিকতক ফুলের তোড়া; দক্ষিণপার্শ্বে একটী মদের বোতল ও একটী গেলাস পড়িয়া রহিয়াছে। হরেন্দ্রের আকৃতিতে মত্ততার লক্ষণ সকলই দেখা যাইতেছিল। তাহার চক্ষু রক্তবর্ণ এবং অর্দ্ধনিমীলিত, বাক্য জড়িত এবং কর্কশ। সে অর্দ্ধঘটিকা সুরাদেবীর উপাসনা করিয়া একাকী উচাটিত ভাবে কাটাইয়াছে, এখন যেন কাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। অবশেষে সে টলিতে টলিতে উঠিয়া বারান্দায় আসিল। ঠিক সেই সময় একখানি গাড়ী আসিয়া নীচে দরজার নিকট থামিল। গাড়ীর ভিতর হইতে প্রথমে একটী পুরুষমূর্ত্তি বাহির হইল, তাহার পশ্চাতে একে একে তিনটী রমণী সস্মিতমুখে নামিল। তিনটীই অল্পবয়স্কা, রূপবতী, অলঙ্কারভূষিতা এবং সুচারু বসন-পরিহিতা। তাহাদের ওষ্ঠ তাম্বুল-রাগে রঞ্জিত, নয়নে বিজলি-হাসি। আর অধিক পরিচয়, বোধ হয়, দিতে হইবে না।

হরেন্দ্র আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। অর্দ্ধজড়িত বাক্যে বলিল—"কে, ভ—বেশ এসিচিস্? এরা সব এসেচে? তবু বাঁচলুম! আমি ত ভেবে ভেবে সারা হচ্ছিলুম। আয়, ওদের ওপরে নিয়ে আয়, ঘরটা আলো হ'ক।" রমণীত্রয় খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। তাহাদের সঙ্গী সেই পুরুষটী (পাঠক বুঝিয়াছেন, এ আর কেহ নয়, ভবেশ) তাহাদিগকে লইয়া মজলিসগৃহে প্রবেশ করিল। ভবেশও মাতাল; তাহার চক্ষু ঢুলু ঢুলু এবং গতি অসাব্যস্ত। সে একটা তাকিয়ার কাছে গিয়া টলিয়া পড়িল।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখিতে হয়। ভবেশ এক্ষণে হরেন্দ্রবাবুর একজন প্রধান সহচর। আজ প্রায় এক বৎসর ইহাদের পরিচয় হইয়াছে, এবং তদবধি উভয়ে পরস্পরের প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। সকল প্রকার কুৎসিত আমোদে সহায়তা করিতে, ভবেশের তুল্য উপযুক্ত লোক হরেন্দ্র আর পায় নাই, সুতরাং ভবেশই এক্ষণে তাহার প্রধান মিত্র। কিরূপে উভয়ের প্রথম পরিচয় হইল, তাহা এস্থলে বলিবার আবশ্যকতা নাই। এক কথায়, চুম্বকে লৌহ আকর্ষণ করিয়াছিল।

ভবেশ, হরেন্দ্র ও বারাঙ্গনাদিগের প্রতি চাহিয়া বলিল—"কৈ, ছোকরা এয়ারেরা কেউ এসে জোটেনি? This irregularity is shameful! বাবা, বরং স্কুল কলেজে লেক্‌চার না শুনে University তে shine কত্তে পার, কিন্তু সাবধান! এতে নেকা চালা'বার যো নাই! এ ইয়ারকির কলেজে খুব Punctual হতে হবে; কাঁটায়

কাঁটায় attend করা চাই। নইলে You are bound to be a total failure! কেমন গা, কথাটা ঠিক কি না?”

হরেন্দ্র ও রমণীরা হাসিতে হাসিতে ভবেশের বাক্যের অনুমোদন করিল। হরেন্দ্র বলিল—“ঠিক বলিচিস ভবেশ; তুই ছাড়া আর এমন খাঁটি কথা কে ব’লবে? বেঁচে থাক্ ভাই।”

ভবেশ পুনরায় আরম্ভ করিল,—“তা ছোঁড়ারা আসুগ আর নাই আসুগ্, We can't wait for them! Let us drink to the memory of our lamented friend নরু and then begin business. নরেন ছোঁড়া দোষে গুণে ছিল ভাল। সবে ছ’দিন হ’ল মারা গেছে, কিন্তু তাকে শীগ্‌গির ভু’লতে পা’রব না। শেষে কিনা লিবার ফেটে died a coward's death! Ignominous! কি বলিস্ বিরাজ?”

বিরাজ হাসিয়া বলিল,—“কি বাপু ইংরিজী বলচ হিজি-বিজি; বাঙ্গালায় বল, উত্তর দিচ্চি। বলি নরেন বাবুর কথা হচ্চে ত? আহা, লোকটা ছিল ভাল। তার মত এয়ার তোমরা কেউ নও।”

ভবেশ—“বটে! সে দু গ্লাসের ওপর এক গ্লাস টেনে সামলাতে পাল্লে না, লিবার ফেটে মারা গেল; সে হ’ল এয়ার; আর আমরা গ্যালন গ্যালন পার ক’রে অচল অটল, আমরা কিনা তার সমযোগ্য নই! বেশ বাবা, আজ বুঝলাম, শাস্ত্রে যে বলে ‘স্ত্রিয়াশ্চরিত্রং পুরুষস্য ভাগ্যং’ তা ঠিক।”

বিরাজ ঈষৎ হাসিয়া হরেন্দ্রের কাণে কাণে বলিল—“দেখবে, ভবেশের সঙ্গে একটু মজা ক’রব?” প্রকাশ্যে

বলিল—"তা যাই বলনা কেন, নরেনের ওপর আমাদের সকলেরই আন্তরিক টান হ'য়েছিল। তার স্বভাবে কেমন একটু গুণ ছিল, যা তোমাদের নাই। ব'লতে নেই, তুমি যদি সেইরকম করে ম'রতে, তা হলে, বোধ হয়, তোমার জন্যে আমাদের এত মন কেমন কত্ত না।" বিরাজের সঙ্গিনীদ্বয় একবাক্যে বলিল "আহা, নরেনবাবু বেশ লোক ছিল", এবং মুখ ফিরাইয়া হাসিতে লাগিল।

ভবেশ কেমনতর একটু ক্ষুণ্ণ হইয়া বলিল,—"Let bygones be bygones; যে গেছে সে গেছে। তার জন্য আবার ভাবনা কেন? আর তোমরা যাই বল, আমার বিশ্বাস যে, নরেন আমাদের মজলিসে মিশিবার যোগ্য ছিল না। গুণের মধ্যে একটু গাইতে পা'র্ত এই যা। বিরাজ, লক্ষ্মী, তোমরা ভাই তাকে ভুলে যাও। Come, let us love each other and be happy in each other's company. আমাদের হাড়ে কি কোন গুণই নাই যে, তোমাদের সুনজরে পড়ি?"

হরেন্দ্র হাসিল। বারাঙ্গনারাও হাসিয়া লুটিপুটি। হরেন্দ্র বলিল—"ভবেশ, এরা তোর সঙ্গে একটু তামাসা ক'রে নিলে। নরেনের জন্যে ত ভেবে এদের ঘুম হয় না; অমন কত নরেন যাচ্ছে, কত আস্চে! কিন্তু তোর মনে সত্যি একটু jealousy হ'য়েছিল, নয়?"

ভবেশ—"তা আর হয় না বাবা? এত যত্ন, এত সাধ্য-সাধনা যদি বৃথা হবে, তা হলে বেঁচে সুখ? God be thanked! এই যে সুরেশচন্দ্র যেন কার্ত্তিকটীর মত এসে

উপস্থিত ;—এস বাপ এস। এইরূপ নানাবিধ সম্বোধন-বৃষ্টির মধ্যে একজন যুবাপুরুষ আসিয়া তাহাদের দল পুষ্ট করিল।

তাহার পর একে একে আরও তিন চারিটী সঙ্গী জুটিল। ভবেশ আলমারি খুলিয়া কয়েকটী বোতল নামাইল। এদিকে হরেন্দ্র রঙ্গিনীদের সঙ্গে রঙ্গরসে মত্ত। নবাগতেরা কেহ কেহ তাহাতে যোগ দিল, কেহ কেহ বাদ্যযন্ত্র বাঁধিতে লাগিল। অতঃপর পানপর্ব্ব। সেই ইন্দ্রিয়সেবীগণ এক রৌপ্যপাত্র হইতে বারাঙ্গনাদিগের উচ্ছিষ্ট মদিরা আগ্রহের সহিত পান করিতে লাগিল। এ উহার হস্ত হইতে পানপাত্র লইতেছে, তাহার হস্ত হইতে আর একজন লইতেছে। পরে লক্ষ্মীত্রয়ের অধরসম্পৃক্ত হইয়া, সেই হলাহলপূর্ণ পানপাত্র পুনরায় দল ঘুরিয়া আসিতেছে। অশ্লীল সম্বোধন ও কুৎসিত রসিকতা সে পথ্যের উপাদান। প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল এই পানোন্মত্ততার জঘন্য দৃশ্য অভিনীত হইল।

ভবেশ তবলা বাঁধিল, আর একজন হারমোনিয়মে সুর দিল। বাদনের সঙ্গে সঙ্গে নর্ত্তকীরা তালে তালে নৃত্য করিয়া গান ধরিল। সে নৃত্য অশ্লীল, সে গীত অশ্রাব্য ; সে কুটিল নয়নভঙ্গী, সে আবেশ-প্রকটিত সস্মিত আনন কুৎসিত কামোদ্দীপক! হরেন্দ্র ও তাহার সহচরবর্গ জড়িত ভাষায় পুনঃ পুনঃ 'বাহবা' 'কেয়াবাৎ' প্রভৃতি উৎসাহসূচক বাক্যে নর্ত্তকীদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে লাগিল। তাহারা সকলেই উত্তেজিত, সকলেই উন্মত্ত।

একঘণ্টা এইরূপ চলিয়া নৃত্য ও সঙ্গীত থামিল। অভিনেত্রীবর্গের উত্তেজনার হ্রাস হইতেছিল ও তৎসহ অবসাদ

দেখা দিতেছিল। পুনরায় পানারম্ভ হইল। ভবেশ ঘোর মাতোয়ারা; সে পঞ্চেন্দ্রিয়ে পূর্ণ আমোদ উপভোগ করিতে-ছিল। কেবল ভবেশ কেন, তাহাদের সকলেরই এই অবস্থা। তাহারা মনে করিতেছিল, এই বুঝি স্বর্গসুখ। ভবেশ বলিল—"হরেন্, ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে আমোদ করা ত আর ভাল লাগে না বাপ্। একথা কতবার বলিচি, কিন্তু তোকে বোঝা'তে পাল্লুম না। বাগান বাড়ীতে চল্; চাঁদের আলোকে, জলের ফোয়ারার কাছে, ফুলবাগানের মাঝে, খোলা জায়গায়, বাসন্তী হাওয়ায় এ আমোদটাতে যে কত মজা, তখন দেখ্‌বি।" আর সকলে আগ্রহের সহিত এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিল। নর্ত্তকীরা আবদার সহকারে হরেনের হস্ত ধরিয়া, ভবেশের প্রস্তাবে সম্পূর্ণ সহানুভূতি দেখাইল। ভবেশ তাহাদের দিকে চাহিয়া চক্ষু টানিয়া বিদ্রূপবাক্যে বলিল,—"আরে তোরা ত ঘরের খবর জানিস্ না; ওর প্রাণে সখটুকু পূর্ণমাত্রায় আছে, কিন্তু মেগের ভয়! বড় সন্তর্পণে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে ইয়ারকি দিতে হয়, পাছে গ্রেপ্তারে পড়ে। ঘর ছেড়ে বাইরে আমোদ করার সাহস কি ওর আছে, তা হলে যে জান বের ক'রে দেবে!" একটা বিকট হাস্যের রোল উঠিল। হরেন্দ্র মহা অপ্রতিভ হইল; পরক্ষণেই সোৎসাহে বলিল—"কি! আমি সে মাগীকে ভয় করি? মিছে কথা বাবা! তা'কে ত লাথির ওপর রেখিচি! আচ্ছা দেখবে, বাগান বাড়ীটা আগে সাজিয়ে নিই। তারপর সেইখানেই আমোদ প্রমোদ হবে।" সকলে সন্তুষ্ট হইল। পুনরায় নৃত্যগীত চলিল।

* * * *

পার্শ্ববর্ত্তী প্রকোষ্ঠ হইতে একটী রমণী দরজার ছিদ্র দিয়া এই পাশব অভিনয় দেখিতেছিল এবং কথোপকথন শুনিতেছিল। রমণী এতক্ষণ অসামান্য সহিষ্ণুতার সহিত মনোভাব দমন করিয়া সেই জঘন্য দৃশ্য দেখিতেছিল, কিন্তু শেষোক্ত কথোপকথন শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার সর্ব্বশরীর স্পন্দিত হইতে লাগিল, বিস্ফারিত নয়নযুগল হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইল; ওষ্ঠ দন্তদ্বারা নিষ্পেষিত হইয়া রুধিরে রঞ্জিত হইল। রমণী ধীরে ধীরে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া মর্ম্মভেদী একটী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল; সেই সঙ্গে বিন্দু বিন্দু উত্তপ্ত অশ্রু তাহার গণ্ড বাহিয়া পড়িতে লাগিল। অভাগীর প্রাণ তৎকালে সাগর-বিক্ষোভের ন্যায় হুতাশে আলোড়িত হইতেছিল। এই অভাগী হরেন্দ্রের স্ত্রী হিরণ্ময়ী।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিবস প্রভাতে হিরণ্ময়ীর মুখ ভারি দেখিয়া পরিচারিকাগণ ত্রস্ত হইল। হিরণ্ময়ী কথা কহিতেছেন না, কাহারও দিকে চাহিতেছেন না। তিনি অন্যমনস্কভাবে কি ভাবিতেছিলেন। গত রজনীতে তাঁহার চক্ষের পলক পড়ে নাই। যেমন শয্যা তেমনি পাতা ছিল, তিনি তথায় শয়ন করেন নাই। অবিরলধারে নয়নবারি গণ্ডদেশ সিক্ত করায় তাঁহার সুন্দর মুখখানি ভারি দেখাইতেছিল। মানসিক যন্ত্রণা ও অবসাদের চিহ্ন মুখমণ্ডলে স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছিল।

প্রিয়তমা পরিচারিকা রাধা দুগ্ধ আনিয়া সম্মুখে ধরিল। হিরণ্ময়ী ক্রোধ ও বিরক্তির সহিত বলিলেন—"কি ও, দুধ? শীগ্‌গির আমার সম্মুখ থেকে নিয়ে যা।" রাধা চমকিতভাবে পশ্চাৎপদ হইয়া বলিল—"কেন দিদি, আজ আবার কি হল?"

হিরণ্ময়ী—"কি আবার হবে, যা চিরকাল হচ্চে তাই! এ বাড়ীর কুকুরও আমার চাইতে লক্ষগুণ সম্মানে আছে! আমায় ত লাথি ঝাঁটার ওপর রেখেচে, আমি আবার মানুষ!" কর্ত্রীর ক্রোধপূর্ণ ভ্রূভঙ্গে রাধা উদ্বিগ্ন হইল। হিরণ্ময়ী বলিতে লাগিলেন—"দাঁড়িয়ে রইলি কেন? যা, দুধ কুকুরের মুখে দিগে। কুকুরের উচ্ছিষ্ট যদি কিছু থাকে ত আনিস্!" ব্যাপার বিষম বুঝিয়া রাধা সরিয়া গেল।

কিয়ৎক্ষণ গত হইলে, অপর একজন পরিচারিকা কর্ত্রীকে স্নানের জন্য অনুরোধ করিল। কুপিতা ফণিনীর ন্যায় তাহার দিকে চাহিয়া হিরণ্ময়ী বলিলেন—"তোরা সকলেই আমার সঙ্গে শত্রুতা আরম্ভ করিচিস্! তোদের কি দেরী সচ্চে না? ভেবিচিস্ কি? এখানে আমি কর্ত্তা না, তোরা কর্ত্তা?" ক্রোধ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। দাসী অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা চাহিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। পাচিকা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া সশঙ্ক ভাবে অপেক্ষা করিতেছে। অন্যদিন ১০টার মধ্যে কর্ত্রীর আহার শেষ হয়, আজ এই সব দুর্য্যোগে দ্বিপ্রহর বাজিয়া গিয়াছে। অনেক সাধ্য-সাধনায় হিরণ্ময়ী আহারে সম্মত হইলেন। কিন্তু আহার করিতে বসিয়া হঠাৎ যেন জলিয়া উঠিলেন, ক্রুদ্ধভাবে বলিলেন "একি, এত ভাত দিয়েচ কেন? আমি কি রাক্ষস

আমার সঙ্গে ঠাট্টা! যে পাচ্চে, সেই আমাকে বিদ্রূপ কচ্চে! আচ্ছা, একদিন এ ব্যবহারের প্রতিশোধ সবাইকে দেব!" এই বলিয়া হিরণ্ময়ী ভাত ফেলিয়া উঠিলেন। কাহার সাধ্য, তাঁহাকে বুঝাইয়া শান্ত করে। সকলেই ভয়-কম্পিত।

অপরাহ্ণে হিরণ্ময়ী পিতাকে একখানি পত্র লিখিলেন। কি লিখিলেন—প্রকাশ নাই, কিন্তু পত্রখানি ক্ষুদ্র। কেহ কেহ বলে যে, হিরণ্ময়ী পিত্রালয়ে যাইবার কথা লিখিয়াছিলেন। হিরণ্ময়ী পত্র লিখিয়া কয়েকবার পড়িলেন; পড়িয়া কি ভাবিতে লাগিলেন; তাহার পর খামে পুরিয়া শিরোনামা লিখিয়া পোষ্ট আফিসে পাঠাইলেন। ভৃত্য পত্র লইয়া অর্দ্ধ পথ যাইতে না যাইতে হিরণ্ময়ী রাধাকে ব্যগ্রভাবে ডাকিয়া বলিলেন "রাধা! শিগ্‌গির যা, চিঠিখানা ফিরিয়ে নিয়ে আয়। বল্, চিঠি ডাকে দিতে হবে না।" দাসী চিঠি লইয়া আসিলে, হিরণ্ময়ী তাহা ছিঁড়িয়া খণ্ড খণ্ড করিলেন।

সন্ধ্যার সময় হিরণ্ময়ীর শয়নকক্ষে রাধা ও হিরণ্ময়ী বিষণ্ণ বদনে উপবিষ্টা। হিরণ্ময়ীর হৃদয়ে যে তুমুল তুফান উঠিয়াছিল, তাহা শান্ত হয় নাই। বিগত রজনীর অনিদ্রা এবং সমস্ত দিন অনাহার তাঁহার মর্ম্মজ্বালা সমভাবেই রাখিয়াছিল। হিরণ্ময়ী বলিলেন—"রাধা, আর বেঁচে কি ফল! শেষ পর্য্যন্ত দে'খলাম,—অপমান, লাঞ্ছনা সকল রকম সহ্য ক'রলাম; আর কেন? এ প্রাণ আর রাখ্‌ব না!"

রাধা—"সে কি, দিদিবাবু; বালাই, অমন কথা কি বল্‌তে আছে? আজ সমস্ত দিন কিছু খাওনি, রাত্রিতে ঘুমাওনি; এমন ক'ল্লে শরীর কতক্ষণ থাকবে?"

হিরণ্ময়ী—"এ শরীর পাত করবো! প্রাণের মায়া ছেড়িচি; সহজে প্রাণ না যায়, কষ্ট দিয়ে তাড়াব! কি অপমান! ব'ল্লে কি না, আমাকে লাথির ওপর রেখেচে,—তাও আবার জন কয়েক বেশ্যা ও বদমায়েসের কাছে! তারা তাই শুনে হাসি ঠাট্টা বিদ্রূপ করতে লাগ্‌ল! এসব দেখে শুনেও প্রাণের মায়া! কি ঘেন্না! আমাকে একটু বিষ এনে দে, খেয়ে মরি; আর সহ্য হয় না!"

রাধা—"দিদি, আর ও কথা ব'লো না। ম'দো মাতালের মজলিসে যে কথাবার্ত্তা হয়েচে, তা শুনে মন খারাপ ক'ল্লে কি চলে? আমি কাল তোমাকে বারণ কল্লুম, ওসব দেখ্‌তে যেওনা, তুমি তা কিছুতেই শুন্‌লে না। তা যা হয়েচে, তার হাত নাই। আমার মাথা খাও, খাওয়া দাওয়া ক'রে মনস্থির কর। তারপর আমি বলি কি, বাপের বাড়ী চল। সেখানে এসব জ্বালা ভুগ্‌তে হবে না।"

হিরণ্ময়ী—"ওকথা আমাকে বলিস্ না! বাপ মা এদের টাকার রা'শ দেখে আমার বে দিয়ে নিশ্চিন্ত আছেন। মনে করেচেন, তাঁ'দের মেয়ে কত সুখেই সংসার ক'চ্চে। হাঃ হাঃ, দেখচিস্ ত রাধা, সেই অগাধ টাকা এখন জলের মত বেরিয়ে যাচ্চে! লোকে লুটেপুটে নিচ্চে! টাকা চুলোয় যাগ্, উৎসন্ন যাগ্! টাকায় আমার কি সুখ!"

রাধা—"দিদি, আর কেন ওকথা—"

হিরণ্ময়ী—"টাকায় কি মনের সুখ হয়? মাথায় অপমান লাঞ্ছনার বোঝা ব'য়ে, হাতে মণিমুক্তোর রা'শ নিয়ে কে সংসারে বাঁচতে চায়? ওরে শোন্, টাকায় সুখ হয় না!

তোর ত টাকা নাই, কিন্তু তুই আমার চাইতে লক্ষগুণে সুখী। আচ্ছা রাধা, সত্যি বল দেখি, তোর অবস্থা আমাকে দিয়ে, আমার অবস্থাটা তুই নিতে রাজি আছিস্? অগাধ টাকা পাবি!" হিরণ্ময়ী উন্মাদিনীর ন্যায় হাঃ, হাঃ করিয়া হাস্য করিলেন।

রাধা—"দিদি—"

হিরণ্ময়ী—"ওলো জানি জানি, সব বুঝি! দোষ কারু নয়, (ললাটে অঙ্গুলি প্রদান করিয়া) এই কপালের! তবে কেন বাপের বাড়ী যাব? টাকার রাশে বসিয়েচেন, টাকার রাশেই প্রাণ বিসর্জ্জন ক'রব! এ দুঃখের কথা বাপ মাকে জা'নতে দেবনা। ওঃ কি অপমান, কি ঘেন্না! হতভাগাদের মাথায় বজ্রাঘাত কেন হলোনা! ভগবানের কি বিচার নাই?"

রাধা দেখিল, হিরণ্ময়ীকে বুঝান অসাধ্য। সে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। হিরণ্ময়ী আকাশ পানে চাহিয়া নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতে লাগিলেন।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

পলাশপুরে রজনী প্রভাত হইয়াছে। মন্দ শীতল সমীরণ বৃক্ষপত্র আন্দোলিত করিয়া, ঝির্ ঝির্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে। অন্ধকার এখনও যেন ভয়চকিত ভাবে পত্রান্তরালে উঁকি ঝুঁকি দিতেছে, এবং তাহার রাজ্য-নাশ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়া পত্রমর্ম্মর-ছলে বিলাপ করিতেছে।

(ঊষা বিহঙ্গ-কাকলীরূপ জয়োল্লাসে ধরায় অবতীর্ণ হইল। বায়সেরা দলবদ্ধ হইয়া, যেন পল্লীকে নিদ্রোত্থিত করার অভিপ্রায়ে কা-কা-রবে উড়িয়া যাইতে লাগিল। পক্ষীগণ দলে দলে নীড়ত্যাগ করিয়া বৃক্ষশাখায় বসিতে লাগিল,—কতকগুলি ডানা ঝাড়িতে ব্যস্ত, কেহ কেহ মধুর শীষ ধরিল। একদল শালিক কর্কশ কলরব করিয়া খাদ্য আহরণে বাহির হইল।)

পাঠক! কৃত্তিবাসের অন্তর্ব্বাটীর মধ্যে একবার দৃষ্টিপাত করুন। দক্ষিণমুখী ঘরের অনাবৃত বারান্দায় একটী রমণী দীনভাবে শয়ানা;—তাঁহার দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুধারা নীরব-প্রকৃতিকে দুঃখ নিবেদন করিতেছিল। পাঠক চিনিলেন কি, ইনি আমাদের বিজয়া? আহা, অল্পদিনে বিজয়ার আকৃতির এতই পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে, চেনা কঠিন। সে কাঞ্চনবর্ণ মলিন, সুগোল পুষ্ট অবয়ব শীর্ণ, এবং বদনের মাধুরী বিষাদ-ঘনাবৃত হইয়াছে। সুন্দর অলকদাম অযত্নে রুক্ষ ও ধূলি-ধূসরিত হইয়াছে। অঙ্গে অলঙ্কার নাই, বেশের পারিপাট্য নাই। অভাগীর দীনবদন ও মলিনবেশ দশা-বিপর্য্যয়ের পরিচয় দিতেছে।

বিজয়া অতি প্রত্যূষে শয্যাত্যাগ করিয়া, এইভাবে বারান্দায় পড়িয়া আছেন। পল্লী-রমণীগণ সুষুপ্ত, সকলেই নিদ্রাসুখ অনুভব করিতেছে; কিন্তু অভাগীর চক্ষে নিদ্রা নাই, প্রাণে শান্তি নাই। ধীরেণের আকস্মিক মৃত্যুর পর, কৃত্তিবাস বিজয়া ও বিমলাকে পলাসপুরে লইয়া আসিয়াছেন। সে প্রায় একমাস হইল। এই একমাস কাল কৃত্তিবাস

প্রগাঢ় যত্ন ও স্নেহ সহকারে বিজয়াকে প্রবোধ দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন; কৃত্তিবাসের স্ত্রী বিবিধ বিধানে তাঁহার অতীত দুঃখ-স্মৃতি মুছিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের অকৃত্রিম যত্ন কতকটা সফল হইয়াছিল বটে, কিন্তু বিজয়ার প্রাণের গভীর বেদনা কিছুতেই উপশমিত হইবার নহে। তিনি দিনের বেলায় সংসারের কাজকর্ম্মে ভুলিয়া থাকিতেন। রজনীর নিস্তব্ধতা যখন দুঃখস্মৃতি জাগাইয়া দিত,—স্বামীর উপেক্ষা ও নির্ম্মম ব্যবহার, মাতৃস্থানীয় শ্বশ্রূর শোকাবহ মৃত্যু এবং প্রাণাধিক পুত্রের অকাল মৃত্যু, যখন মনে জাগিয়া উঠিত, অভাগী নীরবে অশ্রুত্যাগ করিতেন।

বিজয়ার দুঃখ উপলব্ধি করা আমাদের অসাধ্য। তাঁহার দীর্ঘনিশ্বাস প্রাতঃসমীরণের মৃদুমর্ম্মর শব্দে মিশিয়া যাইতেছিল। অশ্রুপূর্ণ বিস্ফারিত নয়নদ্বয় প্রকৃতির দিকে স্থিরভাবে চাহিয়াছিল। ঝরঝরে অশ্রু ঝরিয়া বসন সিক্ত করিতেছিল। বিজয়া ধীরেণের কথা মনে করিয়া কাঁদিতেছিলেন।

প্রভাতে পরিচারিকা লক্ষ্মী আসিয়া বিজয়াকে তদবস্থায় দেখিল। লক্ষ্মী বিজয়ার বাল্যের সাথী ও বড় অনুগত। সে বিজয়ার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া সান্ত্বনাবাক্যে বুঝাইতে লাগিল। বিজয়া ধীরে ধীরে উঠিয়া বসিলেন। লক্ষ্মী চক্ষু মুছিয়া বলিল "দিদি, মনস্থির কর। ভগবান যেমন তোমার একটীকে নিয়েছেন, তেমনি আর একটী দিবেন। তবে মার প্রাণ, সহজে বোঝে না। এই দেখ, বড় বেশীদিনের কথা নয়, ও বৎসর আমার সোণার চাঁদ ছেলে,—বাছা সবে দশ বছরের, কেমন মোটা সোটা,—হঠাৎ আমাকে ফাঁকি

দিয়ে গেল (রোদন ও বসনে চক্ষু মার্জ্জন)! আহা দিদি! তোমার যত্ন-আদরে, অমূল্য আমার অত বড়টী হ'য়েছিল। তোমার কথা সে সর্ব্বদা বল্‌ত, মাসীমা বল্‌তে ঝছা আমার অজ্ঞান হ'ত! তখন কি মনে ছিল, আবাব হেসে খেলে সংসার ধর্ম্ম করব্? তারপর ভগবান আর একটী দিলেন, সে শোক ভুলে গেলাম।" লক্ষ্মী একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিল।

বিজয়া আপন দুঃখ বিস্মৃত হইয়া পরিচারিকাকে বুঝাইতে লাগিলেন। একের দুঃখে অপরের দুঃখ প্রশমিত হইল।

উদয়োন্মুখ সূর্য্যকিরণ অল্পে অল্পে পূর্ব্বাকাশ রঞ্জিত করিতে লাগিল। সেই ঝিকিমিকি রক্তরাগ শ্রেণীবদ্ধ আম্র ও বংশ বৃক্ষের পত্ররাজি-মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া কৃত্তিবাসের গৃহ-চূড়া ও পরিশেষে প্রাঙ্গনে প্রতিভাত হইল। বিজয়া বলিলেন, "লক্ষ্মী, দাদা রাত্রির গাড়ীতে এসেচেন। একটু সকাল সকাল খাওয়া দাওয়ার উদ্যোগ করি চল। রোদ উঠেচে।" বিজয়া উঠিলেন। লক্ষ্মী গৃহপ্রাঙ্গন ঝাঁটাইয়া, গোবর ছড়া দিয়া সংসারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

* * * *

পল্লীগ্রামে মধ্যবিত্ত গৃহস্থের অবস্থা ও চালচলন সচরাচর যেরূপ হয়, কৃত্তিবাসেরও তদ্রূপ। কৃত্তিবাসের পিতার অবস্থা এরূপ ছিল না যে, ইষ্টক নির্ম্মিত গৃহে বাস-সুখ উপভোগ করেন। কৃত্তিবাসের স্বল্প আয়, সুতরাং তিনি গৃহের বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারেন নাই। কিন্তু মৃত্তিকা নির্ম্মিত গৃহে কৃত্তিবাস যে শান্তির রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন,

সৌধবিহারী সম্রাটের তাহা দেখিলে হিংসা হইত। বহির্ব্বাটিতে একটী চণ্ডীমণ্ডপ, তাহার দুই পার্শ্বে দুইটী প্রকোষ্ঠ, একটী অন্দর-সংলগ্ন, অপরটী বৈঠকখানা স্বরূপ ব্যবহৃত হইত। অন্দরে তিনখানি বড় বড় ঘর; দুই খানি পূর্ব্ব ও একখানি দক্ষিণমুখী। সমগ্র বাড়ীটী মৃণ্ময়-প্রাচীর-বেষ্টিত। বিস্তৃত প্রাঙ্গন নিত্য পরিস্কৃত, তাহার এক পার্শ্বে একটী কূপ।

পূর্ব্বদিকের প্রাচীর সংলগ্ন একটী ক্ষুদ্র উদ্যানে কতকগুলি কলাগাছ, দুটী লেবু গাছ; তিনটী উন্নত মাচায় যথাক্রমে শিম, অলাবু ও কুষ্মাণ্ড লতিকা ফল-পত্র-পুষ্প-মণ্ডিত হইয়া সুন্দর শোভা বিকাশ করিয়াছে, নিম্নে সুশীতল ছায়া। স্থানে স্থানে বিবিধ জাতীয় শাক ও বেগুনের গাছ। এক কথায় নিত্য প্রয়োজনীয় সকল প্রকার শাক-সব্জী, ফল-মূল, কৃত্তিবাসের সেই ক্ষুদ্র উদ্যানে উৎপন্ন হইত। উদ্যানের এক অংশে, পাঠক, কতকগুলি পুষ্পবৃক্ষও দেখিতে পাইবেন। জবা, দোপাটী, গাঁদা হইতে সিউলি, কামিনী, মালতী, মল্লিকা, রজনীগন্ধা, গোলাপ প্রভৃতি সকলই সেখানে আছে।

শীতল প্রাতঃ-সমীরণ সেফালিকার স্নিগ্ধ সৌরভ ইতস্ততঃ বিকীরণ করিতেছিল; ভূরি ভূরি গোলাপ ও দোপাটী প্রস্ফুটিত হইয়া, উদ্যানের প্রভাতি-শোভা সম্বর্দ্ধিত করিতেছিল; মধুমক্ষী ও ভ্রমর গুন্ গুন্ তানে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া বসিতেছিল; টুপ্ টুপ্ শব্দে সিউলি পুষ্প বৃক্ষের পাদদেশে ঝরিয়া পড়িতেছিল; এমন সময় চারিটী বালিকা ও তাহাদের সঙ্গে একটী চারি বৎসর বয়স্ক বালক, চক্ষু মুছিতে মুছিতে দৌড়িয়া আসিয়া পুষ্পচয়ন করিতে

লাগিল। পাঠক, ইহাদের মধ্যে আপনার পরিচিতা বিমলাকে চিনিতে পারিয়াছেন কি? বিমল পূর্ব্বাপেক্ষা কৃশ হইয়া গিয়াছে, তাহার আর সে লাবণ্য নাই। এই সুকুমার বয়সেই বালিকা সংসারের দুঃখ-যন্ত্রণার রসাস্বাদ করিয়াছে। বালকটী কৃত্তিবাসের পুত্র অতুল, তাহার বিমলদিদির বড় অনুগত। বিমল তাহার স্নেহের ভাইটীকে হারাইয়া শোকাভিভূত হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে এই বালকের স্নেহে সে শোক অনেকটা বিস্মৃত হইয়াছে। বালিকা-তিনটী বিমলের ক্রীড়াসঙ্গী,—একটী গোলাপফুল, একটী মনমিছরি, তৃতীয়টী সই। বিমল মামার বাড়ী আসিয়া, মনের মত এই তিনটী সঙ্গী পাইয়াছে। তাহার বিষাদমাখা নম্রতায় সকলেই তাহাকে স্নেহ করিত। এই সঙ্গিনীত্রয় সমস্তদিন বিমলের কাছে থাকিত ও তাহার সহিত খেলা করিত। সকালে ইহারা পুকুর-পূজার ফুল তুলিতে আসিয়াছে।

বালিকারা অল্পক্ষণের মধ্যে বিবিধ পুষ্পে সাজি পূর্ণ করিয়া ফেলিল। তাহাদের অন্তরের পবিত্র উল্লাস ও উৎসাহ সুন্দর আননে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। ইন্দু বলিল—"ভাগ্যি কিত্তি মামাদের ফুলবাগানটী ছিল, তাই মনের সাধে ফুল তুলে পূজ' কচ্চি।" রমা বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"হ্যাঁ গোলাপ-ফুল, তোমরা যখন তোমাদের বাড়ীতে ছিলে, তখন ফুল কোথা পেতে? তোমাদের বাড়ীতে কি ফুলবাগান আছে? সেখানে কি এত ফুল হয়?" এই প্রশ্ন বিমলের মনে দুঃখ-চিন্তা সহসা জাগরূক করিয়া দিল। তাহার বাড়ীর কথা এবং সঙ্গে সঙ্গে মৃতা ঠাকুরমা ও ভাইটীর কথা, পিতার অযত্ন,

ও অভাগিনী মাতার নিগ্রহ প্রভৃতি শোকচিত্র মানসপটে উদিত হইল। ঠাকুরমা বিমলকে ছাড়িয়া এক মুহূর্ত্তও থাকিতে পারিতেন না;—তাহাকে নিজহস্তে খাওয়াইতেন, কাছে লইয়া শুইতেন, চুল বাঁধিয়া দিতেন, এবং মাঝে মাঝে বরের কথা বলিয়া কত ঠাট্টা করিতেন। বিমল এ জীবনে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন না! স্নেহের ভাইটীও জন্মের মত ছাড়িয়া গিয়াছে; তাহার সে হাসি খেলা, 'দিদি' বলিয়া সম্বোধন বিমল আর শুনিবে না। বালিকা একটী হৃদয়-ভেদী দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল। কেহ তাহা শুনিল না; কেহই সে নিপীড়িত মনের আবেগ উপলব্ধি করিল না।

বালক অতুল দিদির জন্য বিশেষ উৎসাহের সহিত ফুল সংগ্রহ করিতেছিল। সে এক গাছ হইতে ফুল তুলিয়া বিমলের সাজিতে রাখিতেছে, এবং ছুটিয়া গিয়া আর এক গাছ হইতে ফুল তুলিতেছে। অতুল আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া বলিল,—"দিদি, এই দেখ, তোমার জন্যে কত ফুল তুলিচি, তুমি সেই সেদিন ব'লেছিলে যে, আমাকে একছড়া মালা গেঁথে দেবে! আজ দেবে ত?" রসিকা বিনোদিনী ঠাট্টা করিয়া বলিল,—"আগে সইয়ের বিয়ে হ'ক, কত মালা গাঁথবে।" বিমল ছাড়া অপর বালিকারা হাসিয়া উঠিল, কিন্তু বিমলের হৃদয়ে সুতীক্ষ্ণ বিষাক্ত শায়ক বিদ্ধ হইল। সেই বিবাহের কথা,—বিমলের বিবাহ—যাহা এত অভাবনীয় অনর্থের মূল,—যাহা একটী পরিবারের আজীবন সুখোচ্ছেদ করিতে বসিয়াছে! আবার সেই বিবাহের কথা! বিমলের মুখ পাংশুবর্ণ ধারণ করিল, বুক দুর্ দুর্ কাঁপিতে লাগিল,

নিশ্বাস রোধ হওয়ার উপক্রম হইল। সঙ্গিনীরা তাহার চিত্ত-চাঞ্চল্যের প্রকৃত কারণ বুঝিতে পারিল না। ফুল তোলা হইলে, সকলে স্ব স্ব গৃহে প্রস্থান করিল।

অতুল দিদির বামহস্ত নিজের দুইহস্তে ধরিয়া নাচিতে নাচিতে গৃহে আসিল। বিমলের দক্ষিণহস্তে ফুলের সাজি; সুচিক্কণ কেশদাম বস্ত্রাচ্ছাদিত পৃষ্ঠদেশে আন্দোলিত হইতেছিল; প্রশান্ত সুন্দর মুখখানি বিষাদমাখা; ডাগর চক্ষুদুটী ঊষার সুষমা দেখিতেছিল। সে মূর্ত্তি দেখিলে, পাষাণ হৃদয়েরও মায়ার সঞ্চার হইত।

বিমল আসিবামাত্র তাহার মামী সাদরে তাহাকে বসাইয়া তৈল মাখাইতে লাগিলেন। অতুল কাছে বসিয়া অনিমিষে দিদির মুখখানি দেখিতেছিল। "দিদির সঙ্গে নদীতে নাইতে যাব" বলিয়া পুনঃ পুনঃ সে আবদার করিতে লাগিল, কাহারও বারণ শুনিল না। ইতিমধ্যে বিজয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বিমল, তোর মামা কাল রাত্রিতে এসেচেন শুনিচিস্? বৌ! চল ভাই, একটু সকাল সকাল নাইতে যাই। দাদার ঘুম ভাঙ্গবার আগেই ফিরে আস্ব। লক্ষ্মী গরু দুইয়ে বাজারে গেছে; দাদা বড় গল্লাচিংড়ি ভাল বাসেন, তাই গোটাকতক বড় বড় চিংড়িমাছ আন্তে ব'লে দিইচি।" গামছাস্কন্ধে অতুলচন্দ্রের প্রতি বিজয়ার দৃষ্টি পড়িল। অতুলের মাতা অভিযোগ করিলেন "ঠাকুরঝি, ওকে ত থামাতে পারিনা; ও আমাদের সঙ্গে নাইতে যাবে আবদার ধরেচে, কারো বারণ শুনচে না।" অতুল স্পর্দ্ধা সহকারে মায়ের প্রতি গ্রীবাভঙ্গি করিয়া বলিল, "আমি তোর সঙ্গে

যাব না; পিসিমার সঙ্গে যাব।” বিজয়া হাসিতে হাসিতে অতুলের মুখচুম্বন পূর্ব্বক তা'র মায়ের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তা যাগ্; ওর বাবাও ওইবয়সে মার সঙ্গে কতবার নদীতে নাইতে গিয়েচেন।” অতুলকে তৈল মাখাইয়া বিজয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন।

স্নানান্তে শিবপূজা। পূজা সাঙ্গ করিয়া, বিজয়া উদ্দেশে স্বামীর চরণদ্বয় বন্দনা ও ইষ্টদেবতার নিকট তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলকামনা করিলেন। কৃত্তিবাস তখনও ঘুমাইতেছিলেন। বিজয়া তাঁহার জলখাবার প্রস্তুত রাখিয়া রন্ধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভবেশ যে অমূল্য প্রেম ও সাংসারিকতা হেলায় প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অধুনা কৃত্তিবাসের গৃহে তাহার কথঞ্চিৎ বিকাশ হইয়াছে মাত্র।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে কৃত্তিবাস দেখিলেন, বিমলা এবং খোকা ঘরে বসিয়া পুঁতুল খেলা করিতেছে। তিনি সস্নেহে বিমলার মুখ-চুম্বন করিয়া কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, এবং বাক্স হইতে নূতন কাপড়, জামা এবং খেলার পুঁতুল বাহির করিয়া তাহার হাতে দিলেন। বালিকা সেই অকৃত্রিম স্নেহে যেন অভিভূত হইল;—তাহার মনে আনন্দ-উৎস উথলিয়া পড়িল! সে আর কখনও এত আদর পায় নাই।

কৃত্তিবাস হস্ত মুখ ধৌত করিয়া রন্ধনশালায় বিজয়াকে দেখিতে গেলেন। “বিজয়া কেমন আছ” ভ্রাতার এই সস্নেহ সম্ভাষণে বিজয়ার প্রাণে সুধা ঢালিয়া দিল। তিনি কৃত্তিবাসের কাছে আসিয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন “দাদা, তোমার শরীর ভাল আছে?”

কৃত্তিবাস—"আমি ভাল আছি; কিন্তু বিজয়! তোমার শরীর বেশ সুস্থ হচ্চে না কেন? এর মধ্যে কোন অসুখ হয়নি ত?"

বিজয়া—"না দাদা, এখানে এসে পর্য্যন্ত আমার শরীর একদিনও অসুস্থ হয়নি।"

কৃত্তিবাস—"তবে এত কাহিল হয়েচ কেন?"

বিজয়া (হাসিয়া)—"এমন আর কি কাহিল হইচি দাদা? চিরকালই ত এমনি আছি।"

কৃত্তিবাস—"না বিজয়, তুমি বেশী কাহিল হয়েচ। অসুস্থ শরীরে তোমার এত কাজকর্ম্ম করা হবে না।"

বিজয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন "দাদা, এ সংসারে আর বেশী কাজ কি? তিনটী কি চারটী লোক; বৌ আর আমি দু'জনে কাজ করি। তাও কি বউএর জুলুমে ইচ্ছামত কাজ করবার যো আছে। দু'দিন রাঁধি, ত দশদিন রান্নাঘর মাড়াতে পাই না। তা এ সামান্য কাজটুকুও যদি না করি, তা'হ'লে যে দিন কাটাবার উপায় নাই।"

কৃত্তিবাস—"তা'হ'ক দিদি, অসুস্থ শরীরে সামান্য কাজেও অনিষ্ট হয়। তুমি সেরে ওঠ, তারপর কাজকর্ম্ম ক'রো, কেউ বারণ করবে না।"

বিমলা একখানি পত্রহস্তে দ্রুতপদে আসিয়া বলিল "মা, তোমার চিঠি নাও।" বিজয়া আগ্রহ-সহকারে পত্রখানি লইলেন। কৃত্তিবাস জিজ্ঞাসা করিলেন, "কার চিঠি বিজয়?" বিজয়া বলিলেন, "মনোরমার।" কৃত্তিবাস বহির্ব্বাটী গেলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া পত্রপাঠ করিতে লাগিলেন। এত দুঃখের মধ্যেও তিনি মনোরমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্য ভুলেন নাই। মনোরমার বন্ধুতা তাঁহার ভগ্নহৃদয়ের একটী প্রধান অবলম্বন, এবং নিঃস্বার্থ প্রণয় তাঁহার স্বর্গসুখ। মনোরমা মূর্ত্তিমতী স্নেহরাশি; বিজয়ার অন্ধকারময় অদৃষ্টগগনে একমাত্র আলোকরশ্মি। তাঁহার মরুভূমিবৎ দুঃখ-তাপ-দগ্ধ জীবনে মনোরমা সহানুভূতির শীতল ছায়া দান করিয়াছেন। বিজয়া মনোরমাকে পরমবন্ধু জানিয়াই, স্বীয় সুখ-দুঃখের অংশভাগিনী করিতে ব্যস্ত হইতেন। স্বামীগৃহে একদিনের জন্যও তাঁহার ভাগ্যে সুখাস্বাদ ঘটে নাই, সুতরাং তিনি এতাবৎকাল মনোরমাকে মাত্র তাঁহার ব্যথার ব্যথী করিয়াছেন।

মনোরমার চিঠি শুনিয়া বিমলা ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কাকীমা কি লিখেচেন মা? তিনি কেমন আছেন? খোকা কেমন আছে?" বিজয়া বলিলেন "বস্ মা, চিঠিখানা প'ড়ে নিই, তারপর বল্‌চি।"

কৃত্তিবাসের স্ত্রী রন্ধনশালায় উপস্থিত হইলেন। এইখানে বলিয়া রাখিতে হয়, বিজয়া একটী বিষয়ে ভ্রাতৃজায়াকে আঁটিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা—রন্ধনকার্য্য প্রতিদিন তিনি একাকী করেন, কিন্তু ভ্রাতৃজায়ার চেষ্টা, আদৌ তাঁহাকে রাঁধিতে দিবেন না। শেষে বিজয়া হারি

মানিয়াছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে এই দাঁড়াইয়াছিল যে, বিজয়া যদি দুইদিন রাঁধিতেন, তাহা হইলে কৃত্তিবাসের স্ত্রী চারি দিন রাঁধিয়া নিজের জিদ বজায় রাখিতেন। তবে বিজয়ার আগ্রহাতিশয়ে তিনি এই অঙ্গীকার করিয়াছিলেন যে, কৃত্তিবাস বাড়ী আসিয়া যে কয়দিন থাকিবেন, সে কয়দিন রন্ধনশালায় বিজয়ার একাধিপত্য থাকিবে। বলিতে হইবে না যে, ঈদৃশ জিদ প্রতিদ্বন্দ্বীদিগের মনোমালিন্যের কারণ নহে, প্রত্যুত সম্প্রীতি-পরিচায়ক। স্নেহ ইহার মূল। এই প্রতিযোগিতার অভাবই হিন্দু-পরিবারের একটী প্রধান অশান্তির নিদান।

বিজয়া ভ্রাতৃজায়াকে দেখিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন "বউ, কি মনে করে গা? আজ ত ভাই তোমার পালা নয়। দাদা বুঝি পাঠিয়ে দিয়েচেন?"

ভ্রাতৃজায়া (স্মিতমুখে)—"পালা নয় ব'লে কি রান্নাঘরের ত্রিসীমানায় পা দেওয়া দোষ? তোমার একটু সাহায্য করলামইবা। সে যাহ'ক, সত্যই আজ হুকুম মত তোমার কাছ থেকে হাতা বেড়ী কা'ড়তে এসিচি; রাগ ক'র না ভাই। ঠাকুরঝি! ও কার চিটি?"

বিজয়া—"মনোরমার। বউ, ভাই এসেচ যখন, ডালটে তুমিই নামাও। আমি ততক্ষণ চিটিখানা পড়ে নিই। দাদার মান রা'খলাম বল?" উভয়ে হাসিতে লাগিলেন।

কৃত্তিবাস কিম্বা তাঁহার স্ত্রী মনোরমাকে দেখেন নাই বটে; কিন্তু বিজয়ার নিকট তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া, সকলেই তাঁহাকে ভাল বাসিতেন ও শ্রদ্ধা করিতেন। দূরে

বনান্তরালে লুক্কায়িত গোলাপ-প্রসূনবৎ মনোরমার সদ্‌গুণ-সৌরভ কৃত্তিবাসের গৃহে সুখের পরিমল বিকীর্ণ করিতেছিল। কথায় কথায় মনোরমার নাম হইলে, সকলেরই বদনে আনন্দ বিভাসিত হইত। বিজয়ার পত্রপাঠ শেষ হইলে, কৃত্তিবাসের স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোরমা কি লিখেচেন ঠাকুরঝি?" বিজয়া পত্রখানি তাঁহাকে পড়িতে দিয়া, বিমলকে এইমাত্র বলিলেন যে, তাহার কাকীমা তাহাকে স্নেহ আশীর্ব্বাদ দিয়াছেন। সে পুলকিত-বদনে চলিয়া গেল।

কৃত্তিবাসের স্ত্রী পত্র পড়িতে লাগিলেন ঃ—

"দিদি, অনেকদিন পরে তোমাদের মঙ্গল সংবাদে নিশ্চিন্ত হ'লাম। প্রত্যহ তোমার চিটির জন্য পথপানে চেয়ে থাক্‌তাম। দিদি, তুমি যে আমাদের ভু'লবে, একথা মনে স্থান পায়না। তবে তোমার বড় দুঃখের কপাল, এত অশান্তির মধ্যেও যে আমাদের মনে করেচ, সেটা তোমার গুণ।

"দিদি, মন স্থির কর। কেঁদে কি হবে বল। যে যায়, সে কি আর ফিরে আসে? ভগবান তোমার বড় কঠিন পরীক্ষা ক'রেচেন; অতি অল্পদিনের মধ্যে দুটী ভয়ানক শোক দিয়েচেন! তাঁ'র মহৎ উদ্দেশ্য—অল্পবুদ্ধি মানুষে কি বুঝিবে? ভগবানের চরণে প্রাণ-সমর্পণ ক'রে শোক ভু'লতে চেষ্টা কর। বড় দুঃখ যে, এসময় তোমার কাছে থা'কতে পেলাম না।

"দিদি, তোমরা এখান থেকে যাওয়া অবধি বড় কষ্টে দিন কাটাচ্চি। তোমার স্নেহ আর পাইনা; তোমার মধুর

কথা অনেকদিন শুনি নাই। মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে যে, তোমাদের গিয়ে দেখে আসি। তোমার মুখখানি সর্ব্বদা মনে পড়ে। কখন কখন যেন বিমলের কথা শুনে চমকে উঠি, বোধ হয় যেন বিমল 'কাকীমা' বলে আমায় ডাক্‌চে। দিদি, কতদিন আর এমন করে যাবে। তোমরা এখানে এস, ভগবানের কৃপায় সুখের সংসার পাতাও; তোমাদের দেখে বাঁচি। দিদি, তুমি গিয়ে অবধি আমি মনঃকষ্টে কারো সঙ্গে হেসে কথা কইনি। আমোদ আহ্লাদ মনে স্থান পায়না। যে দিন আমার বিমলের বে দিয়ে মেয়ে জামাই একত্র দে'খব, সেইদিন মনের সকল সাধ মি'টবে; ভগবানের কৃপায় সেদিন শীঘ্রই হবে।

"দিদি, স্বামীই স্ত্রীর দেবতা। স্বামীর কাছে স্ত্রীলোকের মান অপমান নাই, ক্ষোভ লজ্জা নাই। দেবতার ন্যায় স্বামীকে তুষ্ট রাখাই আমাদের সার কর্ত্তব্য। সে পুণ্যের ফল—স্বর্গবাস। আমরা হাজার হ'ক অল্প-বুদ্ধি। অনেক রকমে আমরা স্বামীর বিরাগ-ভাজন হ'তে পারি। কিন্তু উপাসনায়, দেবতা এবং স্বামী তুল্য সন্তুষ্ট হ'য়ে সকল অপরাধ ক্ষমা করেন। দিদি, আমি বলি কি, তুমি ভাসুরকে অনুনয় ক'রে একখানি চিটি লেখ। তিনি হয়ত মোহবশতঃ অকারণ নিষ্ঠুর ব্যবহার করেচেন, কিন্তু তোমরা কখনই তাঁ'র পর নও। তাঁ'র কাছে তোমার অপমান বা লজ্জা নাই। দুর্ব্বুদ্ধি-বশে মানুষ অনেক সময় আপনার জনকে অবহেলা করে; কিন্তু মোহ ছুটিয়া গেলে যখন চক্ষু ফোটে, তখনই আত্মপর দিব্য-চক্ষে দেখিতে পায়।

"দিদি, অধিক আর কি লি'খব। তোমার কাছে চির-কালই উপদেশ নিয়ে চলিচি। আমার কি সাধ্য, তোমার মত বুদ্ধিমতীকে পরামর্শ দিই। আমার মতে ভাসুরকে একখানি চিটি লেখা উচিত। যা' ভাল বোধ হয়, ক'রবে। তোমরা যখন যেমন থাক, একখানি ক'রে চিটি লিখবে। তুমি আমার প্রণাম নেবে, এবং বিমলকে আমার আশীর্ব্বাদ দেবে। ইতি

স্নেহের মনোরমা।"

কৃত্তিবাসের স্ত্রী পত্রখানি বিজয়াকে দিয়া বলিলেন "ঠাকুরঝি, এ চিটিখানি যে প'ড়বে, সেই ব'লবে মনোরমা দেবী। এমন মায়া-দয়া, এমন সুবুদ্ধি দেখা যায় না।" বিজয়া হাসিলেন; সে হাসি সন্তৃপ্ত গর্ব্বমাখা।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া উত্তর লিখিলেন:—"প্রাণাধিকা ভগিনী, তোমার স্নেহের পত্র পেয়ে প্রাণ কতকটা সুস্থ হ'ল। নানারকম ভাবনায় এবং মনের অসুখে তোমাকে চিটি লিখতে দেরী হয়েচে। ভাই, আমার অদৃষ্ট বড় মন্দ; আমার সংস্রবে যে আসে, সে-ই জীবনে অসুখী হয়। তোমার স্নেহের ছায়ায় মন খুলে এ অভাগিনীকে আশ্রয় দিয়ে, তুমিও মনের শান্তি হা'রা'তে বসেচ। ভাই, জগদীশ্বর তোমাকে সুখী ও দীর্ঘ-জীবী করুন, এই প্রার্থনা করি। অতঃপর তুমি আর

অকারণ আমাদের দুঃখভাগিনী হ'য়ো না। কপালের লিখন কে খণ্ডাবে? আমাদের জীবনের ক'টাদিন দুঃখেই অবসান হ'বে। তুমি সুখের সংসারে গৃহিণী হ'য়ে রাজত্ব কর, তা দেখেও মনে অনেকটা শান্তি পাব।

"ভাই, জীবনে যতদিন পর্য্যন্ত মায়া থা'কবে, ততদিন তোমাকে ভোলা অসম্ভব। জীবনাশায় যেদিন নিরাশ হ'ব, সেইদিন তোমাকে ভু'লব। তোমার মুখখানি মনে হ'লে সংসারের ওপর মায়া হয়, ম'রতে ইচ্ছা করে না। মানুষ অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও, কোন একটা সুখ উপলক্ষ ক'রে জীবনভার বহন করে।—এক্ষণে তোমার ভালবাসা এবং দাদার স্নেহ, আমার ও বিমলের শেষ সুখ।

"তোমার ভাসুরকে যেরূপ চিটিলেখা পরামর্শ দিয়েচ, তা যুক্তিযুক্ত ব'লে বোধ হয়। ভাই, তুমি ভিন্ন আমাদের এমন মঙ্গলাকাঙ্খী আর কে? এমন সুপরামর্শ আর কার কাছে পাব? আশায় বুক বেঁধে আজ তাঁকে চিটি লি'খলাম। কিন্তু কি যে হবে, ভগবান জানেন। শাশুড়ী অকুল-পাথারে ফেলে গেলেন, ছেলেটী হারা'লাম! এসব বিপদের সংবাদেও যখন তিনি বিচলিত হলেন না, একবার চেয়েও দেখলেন না, তখন আর আশা কোথায়! তাঁর মন কি নরম হবে? তিনি কি আবার স্নেহের চক্ষে আমাদের প্রতি চাইবেন? ভাই, কি যেন একটা আশঙ্কায় আমার প্রাণের ভিতর কাঁপ্‌চে!

"বিমল তোমাকে প্রণাম দিয়েচে। তোমাকে দে'খতে তা'র বড় সাধ। সে সর্ব্বদা তোমার নাম করে। এখানে তা'র মন টেঁকে না।

"তোমাদের সকলের এবং ঠাকুরপোর মঙ্গল-সংবাদ সর্ব্বদা লি'খবে। খোকাকে আমার আশীর্ব্বাদ এবং জ্যেঠাইমাকে প্রণাম দেবে। তুমি আমার প্রাণের ভালবাসা নেবে। ইতি

তোমার দিদি।"

মনোরমার চিটিখানি ডাকে রওনা করিয়া, বিজয়া ভবেশকে পত্র লিখিতে বসিলেন। কিন্তু কি যে লিখিবেন, কিয়ৎক্ষণ তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। তাঁহার কেমন বাধ' বাধ' বোধ হইতে লাগিল, হাত কাঁপিতে লাগিল, বুক দুরু দুরু করিতে লাগিল। দুই তিনখানি কাগজ ছিঁড়িয়া শেষে নিম্নলিখিত কয়েকছত্র লিপিবদ্ধ করিলেন।—

"শ্রীচরণ কমলেষু—

অনেকদিন আপনার কোন সংবাদ পাই নাই, সে জন্য আমরা বড় চিন্তিত আছি। দয়া করিয়া মাঝে মাঝে আপনার কুশল-সংবাদ লিখিয়া নিশ্চিন্ত রাখিবেন।

"ধীরেন্‌কে হারা'বার পর আমি ও বিমল এ বাড়ী এসিচি। ও বাড়ীতে থাকা বড় কষ্টকর হয়ে প'ড়ল, তাই এখানে এলাম। বাছা ধীরেন আমার এঘর ওঘর ছুটে বেড়া'ত; কখন উঠানে, কখন রান্নাঘরে, কখন শোবার ঘরে হাসি মুখে খেলা ক'রত; কখন মা, কখন দিদি, কখন ঠাকুমার নাম ধরে ডা'কত; কত হাসত, কত আবদার কত্ত। বাছার সঙ্গে সঙ্গে সে সব গেল; সে ছুটাছুটী, সে মধুর ডাক, সে প্রাণভরা আবদার, সব অন্তর্ধান হ'ল! জানিনা, পূর্ব্বজন্মে কি মহাপাপ ক'রেছিলাম, তার এই ভীষণ শাস্তি! মনের যন্ত্রণায় ওবাড়ী ছেড়ে দাদার বাড়ী এসিচি। আজ

প্রায় এক মাসেরও বেশী হ'ল, কিন্তু ধীরেনের শোক কিছুমাত্র ভু'লতে পারি না। আপনার কাছে যদি প্রাণভরে কাঁ'দতে পেতাম, তা'হ'লে, বোধ হয়, এ যন্ত্রণার কতকটা উপশম হ'ত। এখন বু'ঝতে পাচ্চি, মরণ না হ'লে আর আমার শান্তি নাই।

"আপনি কি আমাদের ওপর রাগ করেচেন? আমরা কি অপরাধ করিচি, জানি না। আর অপরাধ ক'ল্লেও আমাদের সকল দোষ কি ধ'রতে আছে। আমরা চিরকালই আপনার ক্ষমার পাত্র। স্ত্রীলোক হাজার হ'ক অল্পবুদ্ধি। অজ্ঞানে আমি যদি কোন দোষ ক'রে থাকি, তা মার্জ্জনা করুন। বিমল ত নির্দ্দোষ, তার মুখপানে চেয়ে আমাকে ক্ষমা করুন।

"আমাদের প্রতি দাদার স্নেহ অশেষ, কিন্তু আপনি থা'কতে তাঁ'র ভারস্বরূপ কেন হই?

"আপনি কেমন আছেন, কবে আমাদের ওবাড়ী নিয়ে যাবেন? দয়া ক'রে শীঘ্র লিখবেন। উত্তরের প্রতীক্ষায় রইলাম। ইতি

আপনার দাসী বিজয়া।"

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কাফিসিন্ধু—যৎ।

কপটীরে প্রাণ দেছি হায়,
আঁখি আশার আশে আশে পাশে ফিরে ফিরে চায়॥
এলনা এলনা ব'লে,
মনাগুণ উঠে জ্ব'লে,
রাকা শশী হাসি হাসি গগনে লুকায়,—
চাতকিনী পাগলিনী প'ড়চে চাঁদের পায়॥
পাপিয়া ত আর বোলেনা,
ঘুমে আকুল সমীরণ,
চুমেনা সে ফুলমধু,
মাতোয়ারা প্রাণ বঁধু,
আসবো ব'লে, গেছে চ'লে,
আমার হৃদয় ধন;
আসবার হ'লে আস্ত নিঠুর, নিশি অবসান প্রায়!

* * রোডের পূর্ব্বপ্রান্তস্থ * * গলির কোন দ্বিতল গৃহের একটী সুসজ্জিত প্রকোষ্ঠে বসিয়া, এক বারাঙ্গনা হারমোনিয়মের সুরে উক্ত গীত গাহিতেছিল। যন্ত্রের সুনিপুণ আলাপনে, এবং গায়িকার স্বরমাধুর্য্যে গান বড়ই চিত্তাকর্ষক হইয়াছিল। তৎকালে রাস্তায় যে যাইতেছিল, সেই কিয়ৎক্ষণ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় দাঁড়াইয়া তাহা শুনিতেছিল।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। সদর রাস্তা মনুষ্যপদশব্দে এবং অশ্বযানের ঘর্ঘরধ্বনিতে শব্দায়মান, কিন্তু গলিটী অপেক্ষাকৃত নীরব।. সহর ব্যাপিয়া সুবিস্তৃত পাপের হাট বসিয়াছে। এ হাটের ক্রেতা বিক্রেতা সকলেই ছদ্মবেশী, এবং পণ্য—প্রতারণা। পাপ-রাক্ষসী অন্ধকারে গা ঢাকিয়া যেন 'হা, হা' বিকট হাস্য করিতেছে। পাপের কিঙ্করীগণ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া, পাপ-সহচরগণের প্রতীক্ষা করিতেছে। বর্ষীয়সীরা এ ক্ষেত্রে প্রচ্ছন্ন-যুবতী, অফুটন্ত বালিকা স্পর্দ্ধমানা কিশোরী! অহো প্রকৃতির ব্যভিচার! ওই যে গোলাপবৎ ফুল্ল বদনমণ্ডলে কতই রূপরাশি দেখিয়া লম্পটগণ উন্মত্ত হইতেছে, প্রভাতে দেখিবে, উহা পাউডার-রঞ্জিত, কুৎসিত এবং লাবণ্যহীন। ওই যে বিস্ফারিত নয়নযুগলে কটাক্ষ এবং হাসির বিজলি কামুকদিগকে মাতোয়ারা করিতেছে, সূর্য্যোদয়ে দেখিবে, উহা কোটরগত, ভাবশূন্য এবং মাধুর্য্যহীন। ফলতঃ পাপিনীদিগকে যাহা দেখিতেছ, উহারা তাহা নহে। কিন্তু কে বলিবে, কতশত হতভাগ্য তাহাদের কুহকজালে বদ্ধ হইয়া, পাপ-স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে!

গায়িকার বয়ঃক্রম উনিশ-কুড়ি বৎসরের অন[illegible]ল্যাম্পের প্রদীপ্ত আলোকে তাহার রূপ যেন উছলিয়া প[illegible]। সে সুন্দরী, তবে অনিন্দ্য সুন্দরী নহে। তাহার দীর্ঘ কৃষ্ণকেশ মস্তকের পশ্চাদ্‌ভাগে বেণীবদ্ধ, এবং সুগঠিত ললাটের উভয়-পার্শ্বে কিঞ্চিৎ স্ফীত। নয়নদ্বয় ঈষৎ কোটর-গত এবং ক্ষুদ্র না হইলেও গাল পুরন্ত বলিয়া অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র দেখাইত। ওষ্ঠদ্বয় একটু অধিক পুষ্ট, যেন বিলাসের আবাস। দশন-

পংক্তি অপেক্ষাকৃত বড় হইলেও, হসিতবদনে বেশ শোভা বিকাশ করিত। অলঙ্কার, বেশ-পরিপাট্য এবং পাউডারে তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য দশগুণ বৰ্দ্ধিত করিয়াছিল। চম্পক-বিনিন্দিত অঙ্গুলি, হারমোনিয়মের পরদায় পরদায় বিবিধ করতব্ করিতেছিল। গ্রীবা বামে ঈষৎ হেলাইয়া রমণী সঙ্গীতের ভাবটী বেশ রক্ষা করিয়াছিল।

গান একবার গাইয়া সে ধরিয়াছে, "কপটীরে প্রাণ দেছি—" এমন সময় এক ব্যক্তি ব্যস্ত-সমস্ত ভাবে গৃহে প্রবেশ করিয়া, গায়িকার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল, এবং তাহার মুখপানে চাহিয়া কোমল ভর্ৎসনাপূর্ণ বচনে বলিল,— "কোন্ কপটীকে প্রাণ দিয়েচ বিরাজ? সে কি আমরা ছাড়া আর কেউ?" এ ব্যক্তি ভবেশ। ভবেশের পরিধানে কোঁচান কালাপেড়ে ধুতি, বেলদার পঞ্জাবী অঙ্গ রাখা ও তদুপযুক্ত কোঁচান উড়ানি; মস্তকে সুগভীর টেড়ি, বস্ত্রে এসেন্সের গন্ধ। কিন্তু মুখমণ্ডল তাহার পাপচরিত্র প্রকটিত করিতে-ছিল। এক কথায় কদাচারী ভবেশের মুখ লাম্পট্যের চিহ্নে গাঢ় অঙ্কিত, কুৎসিত এবং ঘৃণা-উদ্দীপক। এককালে এই ভবেশই সুপুরুষ বলিয়া খ্যাত ছিল।

বিরাজ চমকিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত থামিল। সে ভবেশের মূৰ্ত্তি পার্শ্বে দেখিয়া ঈষৎ বিরক্তি-সহকারে বলিল— "তবু ভাল, আমার ভয় লেগেছিল! কেন বাপু, একটু আস্তে ঘরে ঢু'কলে কি হত?"

ভবেশ মুগ্ধপ্রায়। তৃষিতের ন্যায় সে বিরাজের সৌন্দর্য্য যেন পান করিতেছিল। তাহার হাবভাব ও কথাবাৰ্ত্তায়

স্পষ্টই বুঝা যাইত যে, বিরাজ তাহার দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা। সে একখানি চেয়ার টানিয়া লইয়া বিরাজের পার্শ্বে উপবেশন করিল, এবং জয়দেবের নিম্নোদ্ধৃত দুই পংক্তির আবৃত্তি করিয়া, তাহার প্রগাঢ় অনুরাগের চূড়ান্ত পরিচয় দিল :—

"স্মরগরল খণ্ডনং মম শিরসি মণ্ডনং
দেহিপদপল্লবমুদারম্।"

বিরাজ বলিল—"মরণ আর কি, কত সঙ্ই দিচ্ছ! একদিন তোমার কপালে তাও ঘটবে।"

ভবেশ—"একদিন কেন বিরাজ, আজই হ'ক না! এই মাথা পেতে দিলাম।" ভবেশ মস্তক ঈষৎ নত করিল।

বিরাজ—"যাও, যাও, কি কর! যা ভালবাসি না তাই!"

ভবেশ (হাসিয়া)—"রাগ করিস্ কেন ভাই। বাস্তবিকই তোকে মাথায় রেখেও মনের তৃপ্তি হয়না। যাক্ ওসব কথা! কোন্ কপটীর কথা হচ্ছিল, এখন বলত চাঁদ!"

বিরাজ (রুক্ষস্বরে)—"আবার কে, তোমরাই ত কপটী। তোমরাই বা বলি কেন, তুমি কপটী। কেমন, এখন হল!"

ভবেশ (চক্ষু টানিয়া)—"আমি কপটী? অপরাধ কি লক্ষ্মী?"

বিরাজ—"আর ঘাঁটিও না বাপু, কথায় কথা বাড়ে জান ত? সব কথা খুলে নাই বল্লাম।"

ভবেশ—"না বিরাজ, লক্ষ্মীটী, কপটী কেন ব'ল্লে ব'লতেই হবে।"

বিরাজ—"বটে, তবে শোন। এমন কিছু নয়, এই মনে করনা কেন, হরেন্ বাবু বড় মানুষের ছেলে,—অগাধ সম্পত্তি; কিন্তু আর বছর-খানেকের মধ্যে যে ওঁর কি

দুর্দ্দশা হ’বে, ভা’বলে প্রাণটা শিউরে ওঠে। আমার যা কিছু ওঁরই টাকায়, তাই সময়ে সময়ে ভারি দুঃখ হয়। তোমরা জনকতক বদমায়েস জুটেই ত লোকটাকে মজাবার চেষ্টা ক’রেচ। তোমরা কপটী নও?”

ভবেশ (ঈষৎ লজ্জিতভাবে)—“তা ভাই ওর টাকা আছে, প্রাণে সখ আছে, অকাতরে খরচ ক’রে সখ মেটাচ্চে। এতে আর তোমার আমার দোষ কি? আমরা কেবল ওর আমোদের সহকারী বই’ত নয়। টাকা থাকলে আমরাও ওই রকম খরচ ক’রতাম। কেমন, তুমিই বল না!”

বিরাজ—“আচ্ছা, ওটা ছেড়ে দিলাম। তুমি বিবাহ করেচ, তোমার স্ত্রী পুত্র কন্যা আছে। তা’রা অবশ্য তোমারই ভরসা করে, তোমারই আশাপথ চেয়ে থাকে। তুমি রোজগার ক’রে টাকা পাঠাবে, তবেই তাদের পেটের ভাত জুটবে। কিন্তু কই, তুমি ত ভুলেও একবার তাদের খোঁজ নাও না; তোমার ভাবগতিতে ত বোধ হয় না যে, সংসারে তোমার কেউ আপনার জন আছে! দিন রাত এইখানেই পড়ে থাক। এখনও বলবে, তুমি কপটী নও?” বিরাজ দৃঢ়স্বরে এই কয়টী কথা বলিয়া কুটিল কটাক্ষ করিল।

ভবেশ এবার অধোবদন হইল। বিরাজের ভর্ৎসনা তাহার মর্ম্মে বিঁধিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ মৌনী থাকিয়া লজ্জিত ভাবে ধীরে ধীরে বলিল—“সত্যি বিরাজ, আমার সব ছিল; কিন্তু থা’কলে কি হবে, আমার মন যে কাউকে চায় না। আমি বাস্তবিকই পাপী, কিন্তু সকল সময় তা বু’ঝতে পারি না। তোমাকে ছাড়া অন্যের কথা আমার মনে আসে না।

আমি সব এককালে ভুলিছি।” ভবেশের প্রেমোন্মত্ততা ছুটিয়া গিয়া বিষণ্ণতা দেখা দিল।

ব্যাপার অধিকদূর গড়াইয়াছে দেখিয়া বিরাজ মুহূর্ত্তমধ্যে ভাব পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিল। সে হাসিতে হাসিতে ভবেশের হস্ত স্বীয় হস্তে লইয়া যেন বিস্ময় সহকারে বলিল “একি, তুমি যে সত্যসত্যই মাথায় হাত দিয়ে বসলে! ছি, আমি ঠাট্টা কচ্ছিলাম বইত নয়। অকারণ একটা গানের কথা নিয়ে তুমি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মন খারাপ ক’রে ফেল্লে। যাক্, ওসব কথা ভুলে যাও।” বিরাজ উঠিয়া আলমারি হইতে একটা হুইস্কির বোতল বাহির করিয়া আনিল।

ভবেশ ইতিমধ্যে একটু প্রকৃতিস্থ হইয়াছিল। বিরাজের মুখপানে চাহিবামাত্র তাহার মোহিনী হাসি হতভাগ্যকে অভিভূত করিল। একগ্লাস মদ্য অতি আদরের সহিত তাহার হাতে দিয়া বিরাজ বলিল—“এইটুকু খেয়ে ফেল দেখি, সব সেরে যাবে।” ভবেশ আগ্রহ-সহকারে গ্লাসটী লইয়া এক নিশ্বাসে সেই হলাহল উদরস্থ করিল এবং গ্লাস বাড়াইয়া বলিল—“বিরাজ, আর এক গ্লাস; Oh how sweet!” বিরাজ তাহা পূর্ণ করিলে ভবেশ বলিল—“একটু প্রসাদ ক’রে দাও।” বিরাজ অনুরোধ রক্ষা করিল, ভবেশও নিমেষ মধ্যে দ্বিতীয় গ্লাস নিঃশেষ করিয়া ফেলিল।

অতি সত্বর ভবেশ স্ফূর্ত্তির সপ্তম স্বর্গে উঠিল এবং চক্ষে সমগ্র সংসার যেন বিরাজময় দেখিতে লাগিল। তাহার প্রাণ যাহা চায়, উগ্রমস্তিষ্ক কল্পনার চক্ষে সেই চিত্রই ধরিতেছিল। ভবেশ গভীর উল্লাসে প্রাণ খুলিয়া বলিল—“Three cheers

for বিরাজ ! Darling, you are my all ; আর কিছু নয়, কেবল স্ফূর্ত্তি চাই, নির্ভাঁজ আমোদ চাই, প্রেমের সাগরে ডুবে থাক্‌তে চাই ! বিজয়া ! Fool nonsense ! কে সে ? Hurrah for বিরাজ ! none but বিরাজ can make me happy !"

ঔষধ ধরিয়াছে দেখিয়া, বিরাজ হাসিতে হাসিতে বলিল— "ও গো থাম, যথেষ্ট হয়েচে—খুব ভালবাসা দেখিয়েচ ! আর কেন ? এখন এস, একটু গান বাজনা করা যাগ্‌।"

ভবেশ অকস্মাৎ ব্যস্ত সমস্ত হইয়া পকেট হইতে একছড়া স্বর্ণহার বাহির করিয়া বলিল—"বিরাজ, এই দেখ, আমি ভুলে গেছিলুম, হরেন্ তোমার জন্য এই হার ছড়াটী পাঠিয়েচে। দিব্বি জিনিষ, নূতন প্যাটরন্ ! আয় ভাই তোর গলায় পরিয়ে দিয়ে চোক সার্থক করি ! বড় বাহার খুলবে।" ভবেশ সেই বহুমূল্য হার সযত্নে বিরাজের গলায় পরাইয়া দিল। হার পকেট হইতে তুলিবার সময় একখানি পত্র সেই সঙ্গে উঠিয়া ভবেশের অলক্ষিতে মেঝেয় পড়িয়াছিল। বিরাজ তাহা গোপনে লুক্কায়িত করিল।

তাহার পর বিরাজ গাইল, ভবেশ সঙ্গত করিতে লাগিল।—

বেহাগ—যৎ।

"আমার সাধের বীণে যত্নে গাঁথা তারের হার ;
যে যত্ন জানে, বাজায় বীণে, উঠে সুধা অনিবার।
তানে মানে বাঁধ্‌লে ডুরি, শত ধারে বয় মাধুরী,
বাজেনা আল্‌গা হারে, টানে ছিঁড়ে কোমল তার॥"

গানটী একবার শেষ হইতে না হইতে ভবেশ সঙ্গতে ভুল করিয়া হঠাৎ থামিয়া পড়িল। বিরাজ বিরক্ত হইয়া

বলিল—"আঃ! তোমার আজ হ'য়েচে কি? এরই মধ্যে নেশা ধরেচে নাকি?"

ভবেশ স্বহস্তে একগ্লাস মদ্য ঢালিয়া বলিল—"বিরাজ, আজ মনটার কিছুতেই সুখ পাচ্চি না। কে জানে কেন, সকাল থেকে এই রকম হ'য়েচে। প্রাণটা যেন উড়ু উড়ু ক'চ্চে। কোন মতেই মনের এ ভাব দূর কত্তে পাল্লুম না। ভেবেছিলুম, তোমার কাছে এসে প্রাণটা স্থির হবে, কিন্তু তা হল কৈ?"

বিরাজ—"তবে একটু ঘুমও।"

ভবেশ শয্যায় শয়ন করিল! অল্পক্ষণ পরেই তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল ও সঙ্গে সঙ্গে নাসিকাধ্বনি হইতে লাগিল। বিরাজ সেই অবসরে সঙ্গীত বন্ধ করিয়া ভবেশের পকেট-বিচ্যুত পত্রখানি পাঠে প্রবৃত্ত হইল। এখানি বিজয়ার পত্র। এস্থলে তাহার পুনরুদ্ধারের প্রয়োজন নাই।

একবার দুইবার করিয়া বিরাজ সেই করুণাপূর্ণ পত্রখানি বহুবার পাঠ করিল। কি জানি, সেই ক্ষুদ্র লিপিতে কি সম্মোহন গুণ নিহিত ছিল, তাহা এই রমণীকুলগ্লানি বারাঙ্গনার মর্ম্ম স্পর্শ করিল। সে প্রতিবার পাঠ শেষ করিয়া এক একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল। বৈদ্যুতিক আকর্ষণের ন্যায় তাহার বিস্ফারিত নয়নযুগল বারম্বার সেই পবিত্র বর্ণসমষ্টির দিকে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। পত্রের নিম্নে অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা "আপনার দাসী বিজয়া।" বিরাজের চক্ষে এই কয়টী কথা ক্রমশঃ যেন স্পষ্ট এবং বৃহদায়তন হইয়া পরিশেষে জলন্ত অক্ষরে পরিণত হইল।

তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন সেগুলি হইতে ইতস্ততঃ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতেছে। উঃ, দেখিতে দেখিতে অক্ষরগুলি প্রদীপ্ততেজে গৃহ ব্যাপ্ত করিয়া বিশ্বব্যাপী হইবার উপক্রম করিল! বিরাজের মস্তক ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল। সে ভয়ে বিস্ময়ে পত্রখানি টেবিলের উপর ফেলিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে চমক ভাঙ্গিয়া গেল।

নিদ্রিত ভবেশের দিকে ঘৃণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বিরাজ মনে মনে বলিতে লাগিল—'এতক্ষণে বুঝলাম, এই জন্যে আজ মনে সুখ পাচ্চ না! যাহ'ক, বলিহারি তোমার চরিত্র! তোমার প্রাণটা পাথরে বাঁধা, কিছুমাত্র দয়ামায়া নাই। নিরপরাধ পরিবারের এমন সর্ব্বনাশ ক'রেও ত অকাতরে ঘুমুচ্চ! সতী স্ত্রী, বালিকা কন্যা,—যাদের তুমি একমাত্র ভরসা,—তাদের ওপর এমন নিষ্ঠুর! ধিক্ ভবেশ, তোমাকে আবার বিশ্বাস! একজনের নয়, দুজনের নয়, তুমি অনেকের সর্ব্বনাশ ক'ত্তে বসেচ। কোন দিন আমাকেও পথের ভিখারিণী ক'রবে। কিন্তু সাবধান, আমি বিজয়া নই! যে ক'দিন তোমার দ্বারা দুটাকা রোজগারের সম্ভাবনা আছে, সে ক'দিন তোমার একটু খাতির ক'রব, তা'রপর আর তোমার এখানে জায়গা হবে না। মূর্খ, তুমি আমার কেউ নও, হরেনও আমার কেউ নয়! টাকা পাই ব'লে তোমাদের সহস্র জ্বালাতন সহ্য করি, নইলে বাস্তবিকই তুমি আমার চক্ষুশূল! হরেনের সর্ব্বনাশের আর বড় দেরি নাই; তোমারও পাপ প্রায় ষোলকলা পূর্ণ হ'য়ে এসেচে। আমি দুপয়সার সংস্থান ক'রে নিয়েচি, সুখে ঘুমাও, ভবেশ!!"

ভবেশ ঘুমঘোরে অকস্মাৎ চীৎকার করিয়া বলিল—"বিরাজ, বড় অন্ধকার! একি, আমায় ছেড়ে যেও না!" হতভাগ্য বিভীষিকাময় স্বপ্ন দেখিতেছিল—যেন এক নিবিড় অন্ধকারময় অরণ্যে পথহারা হইয়া, বিরাজ ও সে ইতস্ততঃ ফিরিতেছে, এমন সময় বিরাজ হঠাৎ কোথায় লুকাইল।

বিরাজ এই অতর্কিত প্রলাপবচনে চমকিয়া উঠিয়াছিল। ভবেশের স্বপ্নোচ্চারিত বিকট কণ্ঠরবে তাহার রোমাঞ্চ হইল। কিন্তু পরক্ষণেই বিদ্রূপমাখা নয়নযুগল বিস্ফারিত করিয়া হাসিতে হাসিতে ভবেশের প্রতি চাহিয়া বলিল—"ভয় কি, অকাতরে ঘুমাও! এখনও সময় হয়নি!"

তৎপরে আস্তে আস্তে পত্রখানি বিরাজ ভবেশের পকেটের ভিতর যথাস্থানে রাখিয়া দিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুর্গোৎসব আগত। বঙ্গে আনন্দ ধরিতেছে না। বঙ্গবাসী শোকতাপ ভুলিয়া মহামায়ার চরণে পুষ্পাঞ্জলি দিতে ব্যগ্র হইয়াছে। প্রবাসী মহোল্লাসে গৃহে ফিরিয়াছে। সুদীর্ঘ বিচ্ছেদের পর প্রিয় পরিজন সম্মিলনে আজ তাহার প্রাণ সুখে বিভোর। বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, প্রবীণ-প্রবীণা সকলেরই প্রাণে আনন্দ, সকলেরই যেন সম্বৎসরের সঞ্চিত কোন সাধ এককালে মিটিবে। বঙ্গে আজ কি সুখের দিন!

কিন্তু প্রকৃতই কি আজ সকল গৃহে এ সুখাভিনয় হইতেছে? দুঃখ কি বঙ্গভূমি হইতে এককালে বিতাড়িত হইয়াছে? এমন দিন দেখা যায় না, যে দিন কোন না কোন পরিবারে হাহাকার রোল উত্থিত হয় নাই। যে সময় দশটী পরিবার সুখের অঙ্কে শায়িত, সেই সময় অন্ততঃ দুইটী পরিবারও দুঃখনীরে ভাসমান দেখিতে পাই। ইহাই সংসারের চিরন্তন নিয়ম। আজ কি সেই কঠোর সংসার-রীতির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে?

না। ওই শুনুন, স্বামীহীনা তরুণী নবজাত শিশু বক্ষে লইয়া কি মর্ম্মভেদী বিলাপ করিতেছে! উহার শান্তি কোথায়? অনাথিনী একবার শিশুর মুখপানে চাহিতেছে, আরবার শূন্যগৃহ, শূন্যসংসারের প্রতি চাহিতেছে, পরক্ষণেই উৎসব কোলাহল শুনিয়া অশ্রুজলে সিক্ত হইতেছে। এ আনন্দের দিনে বাল-বিধবার দুঃখ নিদারুণ যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছে। সংসার উহার কাছে শ্মশানবৎ, উৎসবরোল পিশাচ-কোলাহল স্বরূপ! ওদিকে চাহিয়া দেখুন, বৃদ্ধ পিতামাতা, এবং যুবতী পত্নীর একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ, বলিষ্ঠদেহ, উপায়ক্ষম, যুবক বিধাতার নির্ব্বন্ধে আজ মৃত্যুশয্যায় শায়িত! এদৃশ্যে শরীর শিহরিয়া উঠে;—মনে হয়, সুখচিত্র মরীচিকা মাত্র!

পূজার বন্ধে হরিচরণ বাটী আসিয়াছেন। আজ ষষ্ঠী। অপরাহ্ণে তিনি আত্মীয় বন্ধুদিগের সহিত দেখা-শুনা করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন। ভবেশের শূন্য গৃহ, হঠাৎ তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। বিগত বৎসর এই সময় সে গৃহ সজীব ছিল। একটী বালক তথায় কতই উল্লাসে ক্রীড়া

করিত; একটী প্রবীণা কতই যত্নে সেই হতভাগ্য পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করিতেন; একটী বালিকার গোলাপ-কলিকাবৎ ফুল্ল আনন গৃহের কি রমণীয়তা সম্পাদন করিত; একটী লক্ষ্মীরূপিনী সাধ্বী রমণীর পদরেণুতে সে গৃহ পবিত্র ছিল। এক বৎসর যাইতে না যাইতে বালক ও বৃদ্ধা ইহসংসার ত্যাগ করিয়া গিয়াছে; বালিকা ও রমণী স্থানান্তরে আশ্রয় লইয়াছে! কি নিদারুণ পরিবর্ত্তন! হরিচরণ স্থির-দৃষ্টিতে সেই গৃহের দিকে চাহিয়া এই সকল ভাবিতেছিলেন। ভবেশ-পরিবারের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম মায়া, তাই আজ তাঁহার মন নিরতিশয় দুঃখে ব্যথিত হইল।

হরিচরণ অনন্যমনা হইয়া, এই সকল ভাবিতে ভাবিতে ভবেশের শয়নকক্ষের উত্তর প্রান্তস্থ জানালার সমীপবর্ত্তী হইয়াছিলেন। অকস্মাৎ তিনি চমকিয়া উঠিলেন। যেন কাহার দীর্ঘনিশ্বাস শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই যেন কাতরকণ্ঠ-বিনিঃসৃত মর্ম্মভেদী একটী "ওঃ" শব্দ তিনি পরিস্ফুটরূপে শুনিতে পাইলেন। তিনি চকিতের ন্যায় ইতস্ততঃ চাহিলেন, কিন্তু কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার বোধ হইল, শব্দটি ভবেশের গৃহের অভ্যন্তর হইতে আসিয়াছে। সে গৃহ ত জনশূন্য এবং রুদ্ধ, তথা হইতে এ শব্দ আসিবে কি প্রকারে? হরিচরণের রোমাঞ্চ হইল, তিনি দ্রুতপদে গৃহে ফিরিলেন।

সন্ধ্যা হইল। কুলকামিনীগণ দীপ জ্বালিয়া শঙ্খধ্বনি করিলেন। হরিচরণ শয়নগৃহে পর্য্যঙ্কোপরি উপবিষ্ট হইয়া, একখানি পুস্তক পাঠে রত হইলেন। মনোরমা এক্ষণে

গৃহিণী; শাশুড়ীর হস্ত হইতে সংসারের অধিকাংশ ভার লইয়াছেন। বৃদ্ধার যত্নে তিনি রন্ধনকার্য্যে বেশ নিপুণা হইয়াছেন। তাঁহার বড়ই আগ্রহ যে, শাশুড়ীকে এককালে অবসর দিয়া, সংসারের সমগ্র কার্য্য স্বয়ং নির্ব্বাহ করেন, কিন্তু শ্বশ্রূ তাঁহার সে অভিলাষ পূর্ণ করেন নাই। মনোরমা রন্ধনশালায় স্বামীর জন্য খাবার প্রস্তুত করিতেছিলেন। প্রতিবেশী এক আত্মীয়ের গৃহে পূজা; হরিচরণের মাতা আমন্ত্রিত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব্বে তথায় গিয়াছেন। গৃহে ফিরিতে একটু অধিক রাত্রি হওয়ার সম্ভাবনা থাকায়, খগেনকে ভুলাইয়া তিনি একাকী গিয়াছিলেন; কারণ সে জানিতে পারিলে, কখনই তাঁহার সঙ্গ ছাড়িত না।

খগেন মায়ের কাছে বসিয়া প্রস্তুত খাদ্যের প্রতি লোলুপ-ভাবে চাহিয়াছিল। তাহার সতৃষ্ণ দৃষ্টি একবার মায়ের মুখে একবার খাদ্যে নিহিত হইতে লাগিল। পুত্রের ধৈর্য্যচ্যুতির সম্ভাবনা দেখিয়া, মনোরমা হাস্য সম্বরণ করিতে পারিলেন না। হরিচরণ ইত্যবসরে ডাকিলেন—"খগেন, ও খগেন, এখানে আয়।" বালক এতই অন্যমনা হইয়াছিল যে, সে ডাক শুনিতে পাইল না। মনোরমা হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"হ্যাঁ বাবা, তোকে যে ডাকচেন, শুনতে পা'সনি?" হরিচরণ আবার ডাকিলেন—"খগেন, বাবা এখানে এস।" খগেন উচ্চৈঃস্বরে উত্তর দিল—"আমি যে মাল কাচে লইচি; আমাল বল খিদে পেয়েচে; এখন যাব না।" হরিচরণ ও মনোরমা হাসিতে লাগিলেন। হরিচরণ পুনরায় আদর করিয়া ডাকিলেন—"এস বাবা, লক্ষ্মীটী, তোমাকে কত খেলার

জিনিষ দেব এখন।” এবার মনোরমা খগেনকে শিখাইলেন—‘বল, আমি যাব না; মা একলা থাকতে পারবে না, ভয় করবে যে।’ বালক খেলনার লোভ সামলাইতে পারিল না; “মা একলা থাক্‌তে পালবে না, বয় কলবে” বলিতে বলিতে সে ছুটিয়া গিয়া পিতার ক্রোড়ে উঠিল। কীদৃশ অর্ব্বাচীনের হস্তে এতাদৃশ কূটমন্ত্র ন্যস্ত করিয়াছিলেন ভাবিয়া, মনোরমা হাসিয়া অস্থির হইলেন।

রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। খগেন আহার করিয়া নিদ্রাতুর হইল। মনোরমা শয়নগৃহে হরিচরণের খাবার লইয়া আসিলেন, মেঝের একাংশ মার্জ্জিত করিয়া আসন পাতিলেন, এবং তাহার সম্মুখে খাবার ও একগ্লাস জল রাখিলেন। টেবিলের উপর প্রদীপ্ত ল্যাম্প ঘর আলোকিত করিয়াছিল। স্বামীকে আহারে বসাইয়া মনোরমা তাঁহার সম্মুখে উপবেশন করিলেন, এবং অঙ্কস্থিত পুত্রকে ঘুম পাড়াইতে লাগিলেন। হরিচরণ আসনে উপবেশন করিতে করিতেই দম্পতির কথোপকথন আরম্ভ হইল।

হরিচরণ—“মনোরমা! তুমি এতক্ষণ ব’সে বুঝি এই সব কাণ্ড ক’রছিলে? আমি কি এত খেতে পারি?”

মনোরমা (হাসিয়া)—“আমার ভয় হ’চ্চে, তোমার হয়ত আজ খাওয়াই হবে না। রাঁধতে কি জানি, তবু সাধ হয় নিজের হাতে রেঁধে তোমাকে খাওয়াই। তা রান্না যেমনই হ’ক, যেন নিন্দে করনা।”

হরিচরণ আহার করিতে করিতে উত্তর দিলেন—“মনোরমা তুমি বিশ্বাস ক’রবে না, কিন্তু সত্যি বল্‌চি এমন সুন্দর

রান্না অনেকদিন খাইনি। (ঈষৎ হাসিয়া) হাজার হ'ক, মা হাত ধ'রে শিখিয়েচেন, হবে না কেন।"

মনোরমা সলজ্জভাবে স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিলেন—"সত্যি, ঠাট্টা কচ্চ না ত?"

হরিচরণ (হাসিতে হাসিতে)—"আমি ত আগেই বলিচি, তুমি বিশ্বাস ক'রবে না।"

মনোরমা—"কাল দিদির তত্ত্ব নিয়ে পলাসপুরে লোক যাবে। আজ ষষ্ঠী, কাল জিনিষগুলি না পাঠালেই নয়।"

হরিচরণ—"বেশ ত। বিমলের কাপড়, জামা, খেলনা, ও বিমলের মা'র একজোড়া কাপড় কেনা হয়েচে। আর, বোধ হয়, দু'টাকার সন্দেশ পাঠালেই চলবে। কেমন?"

মনোরমা—"তা বই কি। দিদির তত্ত্ব ক'রে কি সাধ মেটে? তবে যেমন অবস্থা, তেমনি কত্তে হবে। আহা, এ পূজার সময় দিদির কি দুর্দ্দিন! সংসারটা একবারে ভেঙ্গে-চুরে গেল (দীর্ঘনিশ্বাস)। অমন মানুষের সংসার কোথায় সুখের হবে, না লক্ষ্মী একবারে ছেড়ে গেলেন!"

হরিচরণ—"যা'র ভাগ্যে বিধাতা যা' লিখেচেন! আমাদের সাধ্য কি তাঁ'র নিগূঢ় উদ্দেশ্য ঘুণাক্ষরেও বু'ঝতে পারি।" দম্পতি এবার মৌনী হইলেন। বিজয়ার কথা উঠিলেই, তাঁহাদের হর্ষ বিষাদে পরিণত হইত। হরিচরণ মনোরমার মুখপানে চাহিয়া অনুচ্চস্বরে বলিলেন—"দেখ মনোরমা, আজ একটা বড় আশ্চর্য্য ঘটনা—"

হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, খগেন জড়িতস্বরে বলিল—"থাকুমা কৈ? আমি থাকুমাল কাচে যাব।" বালক ইস্‌পিস্‌

করিতেছিল; পিতামহীর ক্রোড় ভিন্ন অন্ত কোথাও তাহার ভাল ঘুম হইত না। মনোরমা তাহাকে স্তোকবাক্যে একরূপ শান্ত করিয়া ব্যগ্রভাবে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ, কি ব'লছিলে?"

হরিচরণ—"মনে ক'রেছিলাম, সে ঘটনাটা আর তোমাকে ব'লব না, কিন্তু না ব'লেও থাক্‌তে পা'রলাম না। আজ সন্ধ্যার সময় ভবেশের বাড়ীর কাছ দিয়ে আ'সছিলাম, হঠাৎ কি ভেবে উত্তরের ঘরের জানালার কাছে দাঁড়া'লাম। অল্পক্ষণ পরেই আমার বোধ হ'ল—"

খগেন পুনরায় খুঁৎ খুঁৎ করিয়া ঠোঁট ফুলাইতে লাগিল—বলিল "আমি থাক্‌মাল কাছে যাব।" হরিচরণের কথা শুনিতে মনোরমা এত উৎসুক হইয়াছিলেন যে, খোকাকে সান্ত্বনা করিতে করিতেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"হ্যাঁ, তার পর?"

হরিচরণ—"আমার বোধ হ'ল, যেন ঘরের ভিতর থেকে কার দীর্ঘনিশ্বাস শব্দ স্পষ্ট শুন্‌তে পেলাম। ব'লব কি, সেই শব্দে আমার সর্ব্বশরীর শিউরে উ'ঠল! আমি ছুটে বাড়ী এলাম। মনোরমা, আমি নিশ্চয় বলচি, আমার কোন রকম ভ্রম হয়নি।"

মনোরমা—(ভীতি-বিস্ফারিত নয়নে) "ওমা কি হবে! কি আশ্চর্য্য কথা!"

হরিচরণ—"যাই হ'ক, তুমি যেন কাউকে একথা ব'লো না।"

মনোরমা—"তোমার ভারি অন্যায় যা'হক! মাকে ত ব'লতে হয়!"

হরিচরণ—"না, না। মাকে ব'লেই বা ফল কি? এসব ঘটনা নিয়ে একটা গোলমাল করা উচিত নয়। কি জানি কার কানে উঠবে, আর দশজনে মিলে তিলকে তাল ক'রে ফেলবে। যাক্, এ ঘটনাটায় তোমার কি বোধ হয়?"

মনোরমা—"কি আর বোধ হবে, ভাসুরের সংসারে শনির দৃষ্টি পড়েচে! আমি একটা ঘটনা বলি শোন" এই বলিয়া মনোরমা তাঁহার সেই অত্যাশ্চর্য্য স্বপ্ন-বৃত্তান্ত হরিচরণকে শুনাইলেন। মনোরমার কথা শেষ হইলে, হরিচরণ গম্ভীর-ভাবে বলিলেন—"আশ্চর্য্য! এসব লক্ষণ ভাল নয়! আমার বোধ হচ্চে, এগুলি কোন এক দুর্ঘটনার পূর্ব্বসূত্র।"

মনোরমা—"ভাসুরের খবর কি? এর মধ্যে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েচে?"

হরিচরণ—"না। সে হতভাগা ইদানী একবারে নিরুদ্দেশ হ'য়েচে। দুঃখের কথা ব'লব কি, ধীরেণের মৃত্যু-সংবাদে তার মন কিছুমাত্র বিচলিত হয়নি! মদ বেশ্যায় সে একবারে বিভোর। শু'নলাম, একটা বয়াটে বড়মানুষের ছেলের সঙ্গে জুটেচে। আজকাল তার বাড়ীতেই যত রকম বদমায়েসী হয়, আর বেশ্যা বাড়ী প'ড়ে থাকে। কি অধঃ-পতন! তোমার বাপ ভবেশের চাকরী বজায় রাখ্‌তে অনেক চেষ্টা ক'রেছিলেন, কিন্তু দশ পনর দিন সে আপিসে না যাওয়ায় কর্ম্মটুকু গিয়েচে।

মনোরমা (বিমর্ষ-বদনে)—"তা হ'লে দেখচি, আর কোন উপায় নাই!"

হরিচরণের মাতা গৃহে ফিরিলেন। মনোরমা অবগুণ্ঠন ঈষৎ টানিয়া খগেনকে তাঁহার ক্রোড়ে দিলেন। তিনি হাসিতে হাসিতে আদর করিয়া বলিলেন—"হ্যাঁ দাদা, তুমি এখনও ঘুমওনি?" খগেন "থাকৃমা, তুই কোতা গিইছিলি, আমাকে নিয়ে গেলিনে কেন" বলিয়া আবদার করিয়া কাঁদিতে লাগিল। ঠাকুরমা অনেক বুঝাইয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইলেন। অতঃপর বধূমাতাকে আহার করিতে বলিয়া পুত্রের সহিত রায়েদের পূজা-বিষয়ক অনেক কথোপ-কথন করিলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

কার্ত্তিক মাসের রজনী প্রভাত হইল। সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কুজ্ঝটিকা বিদূরিত হওয়ায় দিঙ্মণ্ডল যেন হাসিতে হাসিতে বিভাসিত হইল। বিগত আট দশ দিবসের মধ্যে এমন নিষ্কলঙ্ক প্রভাত দেখা যায় নাই। আর কেহ এ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করিল কি না প্রকাশ নাই, তবে হিরণ্ময়ী রাধাকে বলিলেন "রাধা, অনেকদিন এমন সুন্দর প্রভাত দেখিনি। আজ যা দেখ্‌চি, তাই যেন চক্ষে নূতন বোধ হচ্চে।" উভয়ে দ্বিতলের ছাদে পাদচারণা ও প্রভাতবায়ু সেবন করিতেছিলেন।

রাধা—"সত্যি দিদি, আজকের সকালটা যেন কেমন একটু নূতন নূতন লাগচে।"

হিরণ্ময়ী—"তুই এ দু'দিন কাছে ছিলিনা রাধা, আমার ভারি কষ্ট হ'য়েছিল। এ পাপপুরীতে এমন দ্বিতীয় লোকটী নাই, যার কাছে দুদণ্ড ব'সে প্রাণ জুড়াই। খুব ভোরে এসিচিস্ যাহোগ্। বাড়ীর সকলে ভাল আছেন, কেমন?"

রাধা—"হাঁ, সবাই ভাল আছেন। মা তোমাকে নিতে কাল সকালে গাড়ী পাঠাবেন। তোমাকে দেখ্বার জন্যে তিনি বড় ব্যস্ত হ'য়েচেন। অনেকদিন দেখেন নি ব'লে, কত দুঃখ কল্লেন, আর,—" রাধা থামিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আর কাঁ'দলেন।"

হিরণ্ময়ী—"বাবা কি বল্লেন?"

রাধা—"কি আর ব'লবেন, তিনিও কত দুঃখ কত্তে লা'গলেন। 'হিরণের কষ্ট হচ্চে, হিরণের অযত্ন হচ্চে,' এই ভাবনায় তাঁরা দুজনেই বড় অসুখী হ'য়েচেন, আর পরামর্শ ক'রে কালই গাড়ী পাঠান সাব্যস্ত ক'রেচেন। তবে এঁরা যদি না পাঠান সেই ভয়।"

হিরণ্ময়ী—"এঁরা? এঁরা আবার কে? বাপের বাড়ী যাওয়া না যাওয়া আমার ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। তা কি তুই জানিস না? আমি কালই এ পাপপুরী ছেড়ে যাব। এখানে আর আমার আপনার কে আছে?"

রাধা—"দিদি, পরশু বাবু অন্দরে এসেছিলেন শু'নলাম।

হিরণ্ময়ী—(ঘৃণা ব্যঞ্জকস্বরে)—"বাবুর প্রেতমূর্ত্তি এসেছিল; আমি দেখিনি। সঙ্গীরা মাতাল অবস্থায় ফেলে গে'ছিল, সেই অবস্থায় বাড়ীর ভিতর আনা হয়। আমার শোবার ঘরে রেখে 'আত্মীয় স্বজনে' শুশ্রূষা কত্তে লাগল। একটা হুলুস্থূল বেধে উঠ্ল। আমি ঘর ছেড়ে দিয়ে পাশের ঘরে রাত

কাটালুম। বড় ঘেন্না হ'ল, দেখতেও গেলুম না। পর দিন জ্ঞান হ'লে যে সেই!" (নিশ্বাস ফেলিয়া) "ও কথায় আর কাজ নেই রাধা। গাড়ী কাল সকালে আস্‌বে ত? ঠিক জানিস্‌! আমার আর একদণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছা নাই। বাপের বাড়ী যাই, হাড় জুড়ুগ্‌।"

রাধা—"আমি ত আগেই তোমাকে সে পরামর্শ দিয়েছিলাম।"

হিরণ্ময়ী—"আমার দুর্ব্বুদ্ধির ফল ভোগ হচ্চে। ইচ্ছা করলেই যদি মরণ হ'ত, তা হ'লে আর ভাবনা কি? এখানে থাকা কেবল জীয়ন্তে মৃত্যু-যাতনা ভোগ।" হিরণ্ময়ী অকস্মাৎ দক্ষিণ চক্ষে হাত দিয়া বলিলেন "দেখ ভাই, আমার ডান চোকটা না'চচে। এ আবার কি?"

রাধা—"ও কিছু নয়। চল দিদি, সকাল সকাল স্নান করবে।"

হিরণ্ময়ীর স্বভাব ইদানীং অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। তাঁহার সন্তপ্ত প্রাণ শান্তির জন্য ব্যগ্র। স্বামীগৃহ তাঁহার কারাতুল্য। তথায় বাস অসম্ভব বোধে অভাগিনী পিতৃগৃহে যাইতে লালায়িত হইয়াছেন। পিতা মাতার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছে। কাল মাতার ক্রোড়ে শান্তিলাভ করিবেন, এ চিন্তা হিরণ্ময়ীর প্রাণে অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ ঢালিয়া দিয়াছিল। তাই হিরণ্ময়ী আজ হাসিমুখে সকলের সঙ্গে কথা কহিতেছিলেন। রাধা বিবিধ বিধানে কর্ত্রীর মনোরঞ্জনে প্রবৃত্ত হইল; যে যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য হিরণ্ময়ী সঙ্গে লইয়া যাইবেন, সে তাহা গুছাইতে লাগিল।

অন্দরে প্রচার হইল যে, কল্য প্রাতে কর্ত্রী পিতৃগৃহে যাইবেন। অন্দর ছাড়াইয়া এসংবাদ ক্রমে হরেন্দ্রের কর্ণে পৌঁছিল। হরেন্দ্র মনোভাব দমন করিতে না পারিয়া আহ্লাদে নাকি বলিয়াছিল "আঃ, তাহলে ত বাঁচি।"

* * * *

বেলা তিনটার সময় হরেন্দ্রের মজলিসগৃহে ভবেশ ও হরেন্দ্র গভীর মন্ত্রণায় নিমগ্ন। প্রচুর সুরাপান করিয়া উভয়ে প্রাণ খুলিয়া কথোপকথন করিতেছিল। হরেন্দ্র বলিল "ঠিক ত, দেখিস্ বাবা, যেন ভেস্তে না যায়!"

ভবেশ—"কোন ভয় নাই। শর্ম্মা যাতে হাত দেবেন, তা কখনই বিফল হবে না। পাঁচটার ভেতর এরা এসে জম্‌বে; তারপর ৬টার সময় আমরা রওনা হব। এখান থেকে আমরা পাঁচজন বেরুচ্চি,—তুই, আমি আর বিরাজের তিন জন। আর সকলে বাগানে Meet করবে। ভাল জুড়ী একখানা তৈয়েরী রাখ্‌তে বলিচিস্ ত?"

হরেন্দ্র—"সে হ'য়ে গেছে, এখন ওদিকের যোগাড় কেমন হল তাই বল্। আমি ত বাবা তোর উপর সব ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত আছি। খ্যাতি অখ্যাতি তোর।"

ভবেশ—"আরে কুচ্ পরোয়া নেই! ইন্দ্রপুরী ক'রে ফেলিচি। সাজসজ্জা প্রভৃতির চূড়ান্ত সরবরাহ হয়েচে। cook, চাকর, সব এতক্ষণ সেখানে হাজির। খাওয়া দাওয়া যোগাড়টা খুব জমকাল রকম করা গেছে। আর rowing, দরকার হয়ত তারও সরঞ্জাম আছে। বাবা কোন ত্রুটী হবে না। খোলা ফূর্ত্তি, অবাধ আমোদ! হাঃ হাঃ!"

হরেন্দ্র—(সহর্ষে)—"বিরাজ! সে নিশ্চয় আস্‌বে ত? বিরাজ না এলে কিন্তু এ আমোদটাই মাটী। সে সকল মজলিসের জান।"

ভবেশ—"পাগল! সে আস্‌বে না ত কাকে নিয়ে এসব? কার জন্য এ আয়োজন? (ব্যস্তভাবে) ভাল কথা মনে পড়েচে, বিরাজের গলায় আজ এক ছড়া ভাল মুক্তাহার না ঝুলালে সে বড় অভিমান করবে। আমাকে ব'লেচে, 'হরেন্ বাবু এতবড় মজলিস্ কচ্চেন, দশজন বড় মানুষ বন্ধু নিমন্ত্রণ ক'রেচেন; সকলের সম্মুখে আমাকে বেরুতে হবে, তার উপযুক্ত এক ছড়া হার না হলে তাঁরই যে মানের লাঘব হবে। তাই বুঝে কাজটা যেন করা হয়।' কথাটা কিন্তু ভাই ঠিক। তার আবদারটা, দাদা, যেমন ক'রেই হোক্ রাখা চাই। নতুবা মান থাক্‌বেনা।"

হরেন্দ্র (মস্তক চুলকাইয়া) "এবার ত ভাই কোন উপায় দেখচি না। আচ্ছা তুই ত ওদের আনতে যাবি, বিরাজকে বুঝিয়ে বলিস যে, আস্‌চে বার তার ইচ্ছা পূর্ণ করব।"

ভবেশ (হাসিয়া)—"তাও কি হয়! এ মজলিসে মান রাখবে কে? আমি উপায় ঠিক করিচি শোন। হিরণ্ময়ীর গলায় একছড়া খুব দামী হার আচে—সেই ছড়াটী যেমন ক'রে হ'ক, আজ তোকে যোগাড় কত্তে হবে। আমি জানি, সে হার তোর বাপ হিরণ্ময়ীকে দিয়েছিলেন, সুতরাং তাতে তোর এক্তার সম্পূর্ণ। অপাত্রে ও সব কেন? ছিঃ ছিঃ।"

হরেন্দ্র (উদ্বিগ্ন ভাবে)—"হিরণ্ময়ী কাল বাপের বাড়ী যাবে, তুই শুনিস্‌নি বোধ হয়?"

ভবেশ—"এঁ্যা, বলিস্ কি? কাল বাপের বাড়ী যাবে? তবে ত দেরী করা উচিত নয়। এখনি যা ভাই, যেমন ক'রে পারিস্, হার ছড়াটা আদায় ক'রে নে।"

হরেন্দ্র—"তুই ত ভাই তার স্বভাব জানিস্; হিরণ্ময়ী বড় রাগী। রাগলে তার সম্মুখে যেতে কেমন ভয় ভয় করে। কি ব'লে চাইব বল্ দেখি? যদি না দেয়?"

ভবেশ—"যা হয়, একটা ঘরগড়া কথা বলিস্। বলিস্ যে, ওই রকম আর এক ছড়া হার গড়াতে হবে, তাই অল্প দিনের জন্য দরকার। তাতে যদি না দেয়, ত কেড়ে নিবি,—সহজ পথ। তবে ভাই, আমি বিরাজদের আ'নতে চ'ললুম, আর বড় বেলা নাই।" ভবেশ চলিয়া গেল।

* * * *

হিরণ্ময়ী পর্য্যঙ্কে শয়ন করিয়া তাম্বূল চর্ব্বণ করিতেছিলেন। রাধা কর্ত্রীর বস্ত্রালঙ্কার বাক্সজাত করিতে করিতে বলিল "দিদি, আর একটু বস; এই কাপড় ক'খানা গুছিয়ে নিয়ে তোমার চুল বেঁধে দিই; বেলা প'ড়ে এল।" তাঁহার ললাটে শ্রান্তির চিহ্ন-স্বরূপ বিন্দু বিন্দু স্বেদ দেখা দিয়াছিল। হিরণ্ময়ী কোন উত্তর দিলেন না। তাঁহার মুখখানি কেমন একটু বিষণ্ণ। অপরাহ্ন প্রায় চারিটা বাজিয়াছে, এমন সময় একজন দাসী আসিয়া সংবাদ দিল "মা, বাবু দেখা কত্তে আস্‌চেন।" হিরণ্ময়ী চমকিয়া শশব্যস্তে উঠিয়া বসিলেন। রাধা গহনার বাক্স চাবি-বন্ধ করিবার উপক্রম করিয়াছিল,—হস্ত হইতে চাবি খসিয়া পড়িল। সে হাসিয়া বলিল, (সে হাসি যেন কেমন একটু অস্বাভাবিক) "দিদি, বাবুর যে

আজ বড় অনুগ্রহ দেখ্‌চি। বুঝি, তোমার বাপের বাড়ী যাওয়ার সঙ্গে এর কোন সংস্রব আছে।”

হিরণ্ময়ী—“ওলো না না! কি জানি কেন, আমার মনে ভাল নিচ্চে না; বুকের মধ্যে কাঁপচে। ওর প্রাণে কি দয়া-মায়া আছে?” বহির্দ্দেশে পদশব্দ শ্রবণ করিয়া, হিরণ্ময়ী চুপ করিলেন।

হরেন্দ্র গৃহে প্রবেশ করিয়া একবার হিরণ্ময়ীর প্রতি, একবার রাধার প্রতি বিলোল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। পরে তাহার দৃষ্টি গৃহের অভ্যন্তরে যাবতীয় দ্রব্যে একে একে নিহিত হইল। হিরণ্ময়ী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় স্বামীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। হরেন্দ্র হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—“কি গা, বাপের বাড়ী যাবে শু’নলাম, তারই বুঝি আয়োজন হচ্চে? তা বেশ, বেশ! যাবে বই কি। চিরকাল একস্থানে থাকা ভাল লাগ্‌বে কেন। কিছুদিনের জন্য বাপের বাড়ী ঘুরে আসা মন্দ নয়।” (রাধার প্রতি) “কি রাধা, তবে **কাল** তোরা ওবাড়ী যাচ্চিস্? কাপড়, চোপড়, গহনা, টহনা গোছান হ’ল নাকি? দেখিস্, যেন আমাদের মায়াটা একবারে কাটিয়ে যাস্‌নে।”

হিরণ্ময়ী (বিরক্তি-সহকারে)—“কাল সকালে আর তোমার এপুরীতে আমাদের দেখ্‌তে পাবে না। তোমার পথে আর কাঁটা হ’য়ে থাক্‌ব না। পার ত সুখে থেক! এখন কি উদ্দেশ্যে আসা হয়েচে?”

হরেন্দ্র (অপ্রতিভ হইয়া)—“না, এই তোমরা যাচ্ছ, তাই দেখা কত্তে এলাম।” (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে)

"ভাল কথা, হিরণ্ময়ী! বের সময় বাবা তোমাকে যে মুক্তার মালাছড়াটি দিয়াছিলেন, তা কি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ?"

হিরণ্ময়ী—"হাঁ যাচ্চি। কেন?"

হরেন্দ্র—"অল্পদিনের জন্য হারছড়াটা দরকার ছিল, সেই রকম আর একছড়া তৈয়ারি ক'রব। আমি বলি কি, এবার না নিয়ে গিয়ে, আমার কাছে রেখে গেলে হ'ত না?"

হিরণ্ময়ী মুহূর্ত্তমধ্যে বুঝিলেন, হরেন্দ্র প্রবঞ্চনা করিতেছে; কিন্তু তাহার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি, স্থির করিতে পারিলেন না। যাহা হউক, তাহাকে নিজের জালে ফেলিবার জন্য উত্তর দিলেন—"না, আমার আর হারের দরকার নাই, সেই একছড়াই যথেষ্ট।"

হরেন্দ্র (থতমত খাইয়া)—"কি জান, আর একছড়া না হ'লে কি চলে? মান, সম্ভ্রম—"

হিরণ্ময়ী—"আমার মান সম্ভ্রমের দরকার নাই। বাপের বাড়ী থেকে ফিরে আসি, তারপর না হয়, দোস্‌রা ছড়া কিনে দিও।"

হরেন্দ্র—"না, না, আমি ভাঁড়াচ্ছিলাম। আমার এক বন্ধুর স্ত্রীর বিশেষ প্রয়োজন হ'য়েচে, আজই চাই। তিনি কোথায় নিমন্ত্রণে যাবেন। কাল না হয় পরশু বাপের বাড়ীতেই হার ফিরে পাবে। শীগ্‌গির দাও।"

হিরণ্ময়ী দৃঢ়স্বরে উত্তর দিলেন—"কি, বন্ধুর স্ত্রীর দরকার হয়েচে? এও কি মিথ্যা কথা নয়? আমার হার আমি কাউকে দেব না।"

হরেন্দ্র—"কেন মিছামিছি ঝগড়া গোলমাল কচ্চ? ব'ললাম, আজ হারছড়াটা দরকার, শীগগিরই ফিরিয়ে দেব। সোজা

কথা ত শু’নবে না। হার কে দিয়েছিল? কার টাকায় কেনা হ’য়েছিল? এখনও মানে মানে দাও বল্‌চি!” হরেন্দ্রের মুখ অনির্ব্বচনীয় পশুভাব ধারণ করিল।

হিরণ্ময়ী ক্রোধ ও ঘৃণায় কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং রাধাকে বলিলেন—“রাধা, শীগ্‌গির হার বা’র ক’রে দে! এরা যে গহনা কাপড় চোপড় দিয়েচে, সে সব বা’র ক’রে দে, কিছু নিস্‌ না! শিগ্‌গির দে! শিগ্‌গির দে!”

রাধা অবাক্‌। এই অভাবনীয় ঘটনায় সে হতবুদ্ধি হইয়া গিয়াছিল। হিরণ্ময়ীর ভ্রুকুটী দর্শনে তাহার চৈতন্য হইল; সে অমনি তাড়াতাড়ি বস্ত্র অলঙ্কারাদি বাহির করিয়া দিল। হরেন্দ্র পুলকিত হইয়া হারছড়াটী বাছিয়া লইল, এবং গমনকালে হিরণ্ময়ীকে বিদ্রূপবাক্যে বলিয়া গেল—“গহনা, কাপড় চোপড় তোমারি থা’কল, তুমি নিয়ে যেতে পার। আমার যা’ দরকার, তা’ আমি পেয়েচি।”

হরেন্দ্র চলিয়া গেলে, হিরণ্ময়ী ক্রোধভরে কয়েকখানি বহুমূল্য বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, এবং অবশিষ্ট বস্ত্র ও অলঙ্কার গৃহে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত করিয়া, মেঝেয় শয়ন করিলেন। তাঁহার দেহ কাঁপিতেছিল। রাধাও স্থির থাকিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। হিরণ্ময়ী তাহাকে বলিলেন, “ওলো মাকে বলিস্‌, আমার যাওয়া হ’ল না; ভগবান আমার ভাগ্যে শান্তিভোগ লেখেননি!” রাধা চক্ষু মুছিয়া উত্তর দিল, “সে কি দিদি, তোমাকে কালই ওবাড়ী নিয়ে যাব। আর এখানে নয়।”

পাঁচটা বাজিল। অট্টালিকার পশ্চিমের এক প্রকোষ্ঠে জানালার পার্শ্বে বসিয়া হিরণ্ময়ী। তাঁহার বসন আলু থালু,

কেশ আলুলায়িত, বস্ত্র ধূলিময়, চক্ষু অশ্রুপূর্ণ ও ঈষৎ রক্তাভ। অভাগী মনের জ্বালায় অধীরা। রাধা কাছে বসিয়া প্রবোধবচনে তাঁহাকে কতকটা শান্ত করিয়াছিল। হিরণ্ময়ী নিস্তব্ধ,—নিস্পন্দ-নেত্রে আকাশের দিকে চাহিয়া ছিলেন।

দেখিতে দেখিতে পশ্চিমাকাশে একখণ্ড কৃষ্ণমেঘ উঠিল। ক্ষুদ্র মেঘ ধীরে ধীরে বৃহদায়তন হইয়া সূর্য্য আচ্ছাদিত করিল। বায়ু অল্পে অল্পে বেগবান্ হইল। পক্ষীকুল কলরব পূর্ব্বক ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া প্রবল ঝটিকার সূচনা জ্ঞাপন করিল। রাধা এই সকল দুর্নিমিত্ত দেখিয়া বলিল "দিদি, বড় ঝড় উ'ঠচে; ভিতরে এস, গা ধুইয়ে চুল বেঁধে দিই। কিসের দুঃখ দিদি? এ দুর্ব্ব্যবহার ত আর নূতন নয়। এই সব অত্যাচার হ'তে নিষ্কৃতির জন্যেই ত বাপের বাড়ী যাচ্চ। কাল থেকে আর এসব কিছুই ভুগ্‌তে হবে না।"

হিরণ্ময়ী বলিলেন "ঠিক বলিচিস্ রাধা, বাপের বাড়ী গেলে সকল যন্ত্রণার অবসান হবে। আচ্ছা, হার কেন নিয়ে গেল, তুই কিছু ঠাওরাতে পেরিচিস্? আমার মনে নিচ্চে, বাপের বাড়ী নিয়ে গেলে (দামী জিনিস) পাছে হাতছাড়া হয়, তাই। আমরা সব চোর, ছেঁচড়, ওর শত্তুর কিনা!! আর না, ঢের হ'য়েচে।"

রাধা—"দিদি, আবার ওকথা কেন? বুঝেও ত বুঝচ না!"

হিরণ্ময়ী—"না, কথায় কথা বল্‌চি। আচ্ছা, যদি তাই হবে, তা'হ'লে অন্য অন্য গহনা হাতে পেয়েও ছুঁলে না কেন? 'বন্ধুর স্ত্রীর জন্য!' কথাটা সত্যি কি? ও হার ছড়াটা নইলে কি বন্ধুর স্ত্রীর মান রক্ষা হচ্ছিল না! না না, ভেতরে

কিছু আছে! কাল বাপের বাড়ী যাব, আজ কিনা এই ঘটনা, এই অপমান! নিশ্চয় এর ভেতরে কিছু আছে!"

রাধা—"দিদি, ঘরে চল।"

হিরণ্ময়ী—"যাচ্চি। আর একটু বস, কাল মেঘ খানা দেখতে বড় সুন্দর।" বলিতে বলিতে হিরণ্ময়ী দেখিলেন, একখানি দ্রুতচালিত জুড়ী সেই রাস্তার দক্ষিণ হইতে উত্তরাভিমুখে যাইতেছে। তাহার অভ্যন্তর হইতে হাস্যরোল উত্থিত হইতেছিল। রমণীরা একদৃষ্টে সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন।

মুহূর্ত্তমধ্যে গাড়ীখানা নিকটবর্ত্তী হইল। তন্মধ্যে পাঁচটী মনুষ্যমূর্ত্তি,—হরেন্দ্র, ভবেশ এবং বিরাজ ও তাহার দুই সঙ্গিনী। একদিকে হরেন্দ্র বামহস্তে বিরাজের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া উপবিষ্ট, সম্মুখে অপর দুই বারাঙ্গনার মধ্যে ভবেশ! হিরণ্ময়ী ও রাধা আরোহীগণের দৃষ্টিপথে পতিত হইবামাত্র ভবেশ গাড়ীর ভিতর হইতে তাহাদের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া "hurrah, hurrah for বিরাজ" বলিয়া চীৎকারধ্বনি করিল। হরেন্দ্র বিরাজের কাণে কাণে কি বলিল; সে গ্রীবা বাড়াইয়া হিরণ্ময়ীর দিকে চাহিল এবং পরক্ষণেই হাসিয়া মুখ ফিরাইল। আর হিরণ্ময়ী সবিস্ময়ে দেখিলেন, বিরাজের গলায় তাঁহার সেই মুক্তাহার শোভা পাইতেছে! তাহার পর নিমেষ মধ্যে গাড়ী দৃষ্টিবহির্ভূত হইয়া গেল। হিরণ্ময়ী বাতায়ন পথে দাঁড়াইয়া একটা মিশ্রিত হাস্যরোলের ক্ষীণ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইলেন।

"রাধা, রাধা, আর সহ্য হয়না" বলিয়া ক্রোধে ও ঘৃণায় হিরণ্ময়ী ধরাশায়িত হইলেন। পরক্ষণে কুপিতা ব্যাঘ্রীর ন্যায়

জানালার লৌহদণ্ড ধরিয়া রাস্তার দিকে অঙ্গুলি প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিলেন "ওলো দেখলিনে, সেই হার কার গলায় উঠেচে? বন্ধুর স্ত্রী! একটা বেশ্যা! (কাঁদিতে কাঁদিতে) ওঃ, সয়তানও ত এত প্রবঞ্চনা জানে না! দেখিস্, এপাপে উৎসন্ন যাবে! নিশ্চয় যাবে! নিশ্চয় যাবে!! তুই দেখিস্, আমারই দেখা হ'ল না।" হিরণ্ময়ী উন্মাদিনী-প্রায়।

ভীষণবেগে ঝটিকা প্রবাহিত হইল। জানালা দরজা ঝনঝনা শব্দে আলোড়িত হইল। গগনব্যাপী মেঘের অন্ধকার-ছায়া ধরণীকে গাঢ় কালিমায় আচ্ছাদিত করিল। প্রকৃতির সেই প্রলয়-প্রকট-মূর্ত্তি দেখিয়া ধরিত্রী যেন চকিতা,—প্রাণী-কুল ভীত, উদ্বিগ্ন। রাধা অশ্রুর জল মুছিতে মুছিতে হিরণ্ময়ীর হাত ধরিয়া বলিল "এস দিদি, আমার মাথা খাও, চল আজই আমরা বাড়ী যাই।" হিরণ্ময়ী হা হা করিয়া হাসিয়া উত্তর দিলেন "বালাই, তোর মাথা খেতে গেলাম কেন? তুই আমার কি করিচিস্? শত্তুরের মাথা খাব। তুই এখন যা।"

রাধা—"দিদি, আজই বাড়ী চল। আমাদের যা আছে নিয়ে এস, আজই এখান থেকে যাই। একখানা গাড়ী আন্‌তে ব'লে দিই?"

হিরণ্ময়ী (বিরক্তি সহকারে)—"ওলো না, না, সে পরে হবে; তুই এখন যা। আমি আজ একা থা'কব, তুই যা।"

রাধা হতাশ হইল। হিরণ্ময়ীকে শান্ত করা তাহার সাধ্যাতীত।

* * * *

গম্ভীর রজনীতে হরেন্দ্রের প্রাসাদ তুল্য ভবনে প্রতিহত হইয়া প্রবল ঝটিকা একপ্রকার লোমহর্ষণ-কর অপার্থিব ধ্বনি করিতেছিল। যেন বায়ু শত সহস্র পিশাচের ভীষণ যন্ত্রণাব্যঞ্জক আর্ত্তনাদে পূরিত। রহিয়া রহিয়া তুষারবৎ শীতল পবন উচ্ছ্বাসে বহিতেছিল। জগৎপ্লাবী ঘোররোল দিগন্তে গর্জ্জিতেছিল। এহেন কালে চেতন জগতের অলক্ষিতে সেই অট্টালিকার কোন ক্ষীণালোক-প্রতিফলিত প্রকোষ্ঠে এক শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হইল। ক্ষোভে, ঘৃণায়, নৈরাশে হতভাগিনী হিরণ্ময়ী আত্মহত্যাদ্বারা দুঃখময় জীবনের অবসান করিলেন।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ভয়ঙ্কর ঝড় বহিতেছিল। মেঘের পর মেঘ যেন বিরাট-তাণ্ডবে ছুটিতেছিল। একে অমানিশা, তাহাতে কৃষ্ণমেঘ মেদিনীর মুখ আবৃত করিয়াছে, সুতরাং অন্ধকার সূচীভেদ্য। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকিতেছে। ঝড়ে বড় বড় বৃক্ষের শাখা ভীষণরূপে আলোড়িত হইতেছে, এবং বংশবৃক্ষের পরস্পর সংঘর্ষণে একপ্রকার লোমহর্ষণ আরাব উত্থিত হইয়া, জাগ্রত ভয়বিহ্বল মনুষ্যের অন্তঃকরণে ভীতি সঞ্চার করিতেছে।

এহেন ভয়ঙ্কর রজনীতে পলাসপুরের রাস্তায় একটী মনুষ্য-মূর্ত্তি দ্রুতপদে চলিয়াছে। এখনও দ্বিপ্রহর বাজে নাই। ক্ষণপ্রভা পথিকের পথ-প্রদর্শনে বিশেষ আনুকূল্য করিতে-

ছিল। তিনি ত্রস্তভাবে ছুটিতেছেন। কোথাও জনপ্রাণীর শব্দমাত্র নাই। ঝটিকার হুঙ্কার, মেঘের গর্জ্জন, তাঁহাকে অণুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে নাই; কারণ, একটী ভীষণতর ঝটিকা তাঁহার অন্তর্জগৎ প্রপীড়িত করিতেছিল। তিনি গ্রামে প্রবেশ করিলেন। বিদ্যুদালোকে একটী পুরাতন মন্দির পথিকের দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র তিনি করযোড়ে বলিলেন "মা, অধম সন্তান চিরদিন ত কায়মনোবাক্যে তোমার চরণ-সেবা ক'রেচে, তবে একি শিক্ষা দিচ্চ? বিজয়ের শাস্তি যে আমারও শাস্তি! মা প্রসন্না হও।" এ কাতরোক্তি তাঁহার মর্ম্মস্থল হইতে উচ্চারিত হইল।

পথিক কৃত্তিবাস। বিজয়ার এক পত্রে বিমলার উৎকট পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি গৃহে আসিতেছেন। পরিতাপের বিষয় এই যে, সংবাদ দুইদিবস পূর্ব্বে পাইবার কথা, কিন্তু স্থানান্তরে যাওয়ার জন্য তাহা সবে মাত্র সেইদিন অপরাহ্নে পাইয়াছেন। পত্র পাইবামাত্র তিনি ঔষধাদি লইয়া বাহির হইয়াছেন। গৃহে কয়টী অসহায় স্ত্রীলোক, তাহাতে আবার গ্রামে ভাল চিকিৎসকের অভাব! অহো, তাহাদের কি বিপদ! কৃত্তিবাস মনে মনে ভাবিতেছিলেন "হায়! বিধাতা একান্তই আমার প্রতি বাম! নতুবা এমন সময় আমি স্থানান্তরে গিয়াছিলাম কি জন্য?"

কৃত্তিবাস যতই গৃহের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার পদদ্বয় অবশ ও শরীর অবসন্ন হইতে লাগিল। তিনি কম্পিত-পদে ছুটিতে লাগিলেন। বন্ধুর পথে বারম্বার তাঁহার পদস্খলন হইল। ঝটিকা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল।

মুহুর্মুহুঃ বিদ্যুৎ চমকিতে লাগিল। কৃত্তিবাস জ্ঞান-হারা,—হয়ত গৃহে এতক্ষণ কি ভয়ানক দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে ভাবিয়া, তিনি নৈরাশে অধীর হইলেন, এবং পুনঃ পুনঃ দুর্গানাম জপিতে লাগিলেন। চিকিমিকি বিদ্যুৎ ঝলসিল; কৃত্তিবাস চমকিয়া দেখিলেন, সম্মুখেই তাঁহার গৃহ, গৃহের সদর দরজা উন্মুক্ত। দ্রুতপদে প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া ইতস্ততঃ চাহিয়া দেখিলেন, পূর্ব্বদ্বারী ঘরের দরজা ও জানালার ছিদ্র দিয়া দীপরশ্মি বাহির হইতেছে। নিকটে গিয়া চীৎকারস্বরে ডাকিলেন "বিজয়! বিজয়! লক্ষ্মী!" কপাট ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হইল। লক্ষ্মী বাহিরে আসিয়া বলিল, "কে, দাদা এলে?" এত দেরি হ'ল কেন দাদা? আর কি বিমলকে বাঁচাতে—!" কড় কড় শব্দে ভীষণ বজ্রনাদে তাঁহার কথা ডুবিয়া গেল। কৃত্তিবাস ছুটিয়া উন্মত্তের ন্যায় ঘরে প্রবেশ করিলেন।

শয্যাপার্শ্বে বসিয়া এ রমণী কে? আহা কি রমণীয় মূর্ত্তি! কৃত্তিবাস ত কখন ইহাকে দেখেন নাই। বিজয়া কোথায়? তিনি বিস্মিত হইলেন। লক্ষ্মী বলিল "দাদা, ওঁকে চিন্তে পাচ্চনা? উনি আমাদের ছোট দিদি—মনোরমা। বিমলের ব্যামোর খবর পেয়ে আজ চারদিন হ'ল এখানে এসেচেন।" মনোরমা শিরোবস্ত্র ঈষৎ টানিয়া দিলেন।

ঘরে একটী প্রদীপ মিটিমিটি জ্বলিতেছে। শয্যায় বিমলের কঙ্কালাবশেষ মূর্ত্তিখানি জীবন ও মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া যেন প্রতিমুহূর্ত্তে লয় প্রতীক্ষা করিতেছিল। শয্যা-পার্শ্বে বসিয়া মনোরমা ও কৃত্তিবাসের স্ত্রী। উভয়েই বিষাদ-সাগরে

ভাসমানা। স্নেহময়ী মনোরমা অতিযত্নে, অতি সন্তর্পণে, অতি স্নেহভরে সেই আসন্ন-মৃত্যু বালিকার শুশ্রূষা করিতেছিলেন। তিনি অহোরাত্র সেই একই ভাবে কাছে বসিয়া বিমলাকে ঔষধ খাওয়াইতেছিলেন; তাহার গাত্রে ধীরে ধীরে হস্তাবমর্ষণ ও ব্যজন করিয়া রোগ-জর্জ্জরিত দেহে স্বস্তি দিতেছিলেন, এবং উৎসাহ বাক্যে যথাসাধ্য তাহাকে আশ্বস্ত করিতেছিলেন। কিন্তু অভাগিনী বিজয়া কোথায়! পাঠক, ওই দেখুন, বিজয়ার অস্থিসার কলেবর খানি শয্যাপার্শ্বে ধূলায় লুণ্ঠিত হইতেছে। আহা, অভাগিনী আর কত সহিবে! মনুষ্যের সহিষ্ণুতার এক সীমা আছে, বিজয়ার তাহা অতিক্রান্ত হইয়াছে। তাঁহার প্রাণের বিমল, তাঁহার সর্ব্বস্বধন বিমলের অন্তিমকাল উপস্থিত, বিজয়া তাহা বুঝিয়াছিলেন। ওঃ, অভাগিনী মনের আবেগে অধীরা, পাগলিনী-প্রায়! তিনি একবার ছুটিয়া আসিয়া বিমলের কাছে বসিতেছেন, পরক্ষণেই তাহার যন্ত্রণা দেখিয়া ভূমিতে পড়িয়া কাঁদিতেছেন; আবার উঠিয়া বিমলের শুশ্রূষা করিতে গিয়া অধীর ভাবে রোদন করিতেছেন। মনোরমা অমানুষিক স্থৈর্য্যবলে মনের আবেগ সম্বরণ করিয়া বিজয়াকে বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছেন, কিন্তু মনে মনে বলিতেছেন, "হায় ভগবান! এদৃশ্য আর দেখিতে পারিনা।"

বিজয়া মেঝেয় পড়িয়াছিলেন, পদশব্দে আশান্বিতা হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার শীর্ণদেহ খানি শ্মশানভূমিতে প্রেতমূর্ত্তিবৎ বোধ হইল;—কেশ রুক্ষ ও আলুথালু, বসন ধূলিধুসরিত এবং দেহচ্যুত; বিশুষ্ক পাংশুবর্ণ বদনে অশ্রুসিক্ত নয়নদ্বয় অপার্থিব তেজে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। বিজয়া

মনে করিয়াছিলেন, বুঝি ভবেশ তাঁহার পত্র পাইয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়াছে, বুঝি এ সংবাদে তাঁহার পাষাণ হৃদয় বিচলিত হইয়াছে। কৃত্তিবাস বিজয়াকে দেখিয়া উৎসাহ-বচনে বলিলেন "বিজয়া! ভয় কি দিদি! এই আমি এসেছি।" ভবেশ আইসে নাই দেখিয়া বিজয়া নৈরাশে যেন বজ্রাহত হইলেন, এবং উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া বলিলেন, "দাদা, দাদা! ওই দেখ দাদা, ওই আমার বিমল। আমার সোণার বিমলের কি চেহারা হ'য়েছে, একবার দেখ দাদা! আমার বিমলকে বাঁচাও! নিরাশ্রয়াকে ভাত দিয়ে বাঁচিয়েচ, ঘরে আশ্রয় দিয়েচ, এবার রোগের হাত থেকে বাঁচাও। কৈ দাদা, তিনি এলেন না! এ বিপদে তিনি আমাদের ভুলে রহিলেন!" আকাশ-বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া করাল অশনি গর্জ্জিয়া উঠিল। পবন যেন বিষাদে হুতাশে হুহু শব্দে কোথায় চলিয়া গেল।

বিমলার জীবনীশক্তি খুব দ্রুত হ্রাস হইতেছিল। চক্ষু নিমীলিত, নিশ্বাস টানা এবং কষ্টকর, ওষ্ঠ ধীরে ধীরে স্পন্দিত হইতেছিল। মনোরমা বুঝিলেন, অল্পক্ষণেই বিমলের ইহলীলা ফুরাইবে, কিন্তু অসামান্য স্থৈর্য্যের সহিত তিনি বালিকার শেষ মুহুর্ত্তেও সেবা করিতে লাগিলেন। হায়! বিমল যে তাঁহার পেটের মেয়ে অপেক্ষাও আপন, বিমল যে মায়ের অপেক্ষা তাঁহাকে অধিক ভালবাসিত; বিমল যে কাকীমা বলিতে অজ্ঞান হইত! স্নেহময়ী সহস্র বৃশ্চিক দংশন যাতনা হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতে লাগিলেন। কৃত্তিবাস মনোরমার হাতে ঔষধের শিশি দিয়া

বলিলেন "দিদি তুমিই ওষুদটা খাওয়াও! আমার হাত কাঁপচে।" মনোরমা বিমলাকে একদাগ ঔষধ খাওয়াইলেন; তাহার কতকটা কপোল বাহিয়া পড়িয়া গেল, অল্পই গলাধঃকৃত হইল।

রাত্রি তিনটার পর ঝটিকার প্রকোপ অকস্মাৎ মন্দীভূত হইল! সুশীতল পবন তরুপত্রে মর্ম্মর ধ্বনি করিতে লাগিল। প্রকৃতির সে অবসাদ ক্ষণস্থায়ী, পুনর্বিক্ষোভের সূচনা মাত্র। অন্ধকার ঘনীভূত হইল। টুপ্‌টুপ্ বৃষ্টি পতন শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। এমন সময় বিমল ধীরে ধীরে চক্ষু মেলিল, এবং কম্পিত ওষ্ঠে, অস্পষ্ট স্বরে ডাকিল "মা"। বিজয়ার কর্ণে সে মধুর শব্দ পৌঁছিবামাত্র লুপ্ত আশা জাগিয়া উঠিল। "মা, মা, মা আমার, সর্ব্বস্বধন আমার, এই যাই মা" বলিয়া ধূলিশয্যা ছাড়িয়া বিজয়া তড়িদ্বেগে উঠিয়া বসিলেন, কিন্তু দাঁড়াইতে পারিলেন না। মনোরমা তাঁহার কম্পান্বিত দেহ-যষ্টি অতি সাবধানে বিমলের পার্শ্বে বসাইলেন। বিজয়ার অণুমাত্রও শক্তি ছিলনা, তিনি অবসন্ন ভাবে মনোরমার বক্ষে হেলিয়া পড়িলেন। বিজয়াকে কন্যার পার্শ্বে বসাইয়া মনোরমা ধীরে ধীরে ডাকিলেন "বিমল, মা, এই চেয়ে দেখ, তোমার মা কাছে রয়েচেন।" বিমল ধীরে ধীরে আবার চাহিল, কিন্তু অহো, বিজয়া মূর্চ্ছিতা! অভাগিনী প্রাণাধিকা কন্যার অস্থিমাত্রাবশেষ হস্তখানি স্বীয় শোক-জর্জ্জরিত বক্ষে স্থাপিত করিয়া অচেতন হইয়াছেন। বিমলের দৃষ্টি মনোরমার মুখে পতিত হইল; সে দেবীমূর্ত্তি দেখিয়া বিমল বুঝি ঈষৎ হাসিল—বালিকার ওষ্ঠ ঈষৎ স্পন্দিত হইল। মনোরমা

বুঝিলেন, বিমল কি বলিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু বাক্য সরিল না। তিনি বিমলের মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া করুণ-স্বরে ডাকিলেন "মা বিমল, চেয়ে দেখ মা; আমাকে চিন্তে পেরেচ মা!" বালিকা নয়ন মুদিত করিয়াছিল। কৃত্তিবাস 'মা', 'মা', করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। কৃত্তিবাসের স্ত্রী ও লক্ষ্মী কাঁদিয়া আকুল। সকলেই বুঝিলেন, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপের ক্ষণিক উজ্জ্বলতার ন্যায় বিমলের সেই শেষ আহ্বান! বিমলের সে দৃষ্টি, ইহজগতের প্রতি শেষ দৃষ্টি! মনোরমা হতাশের উদ্যমের ন্যায় বিমলের মুখে একটু ঔষধ দিলেন। সকলে ধরিয়া বিজয়ার অচেতন দেহখানি মেঝের শয্যার উপর শায়িত করিলেন।

সুদূরে, অতিদূরে এক অস্ফুট নিনাদ শ্রুত হইল। তাহা প্রলয়-প্রকট হাহাকারের ন্যায়, অতীব ভীতিপ্রদ! প্রচণ্ড-বেগে ভীষণ-গর্জ্জনে ঝটিকা পুনঃ-প্রবাহিত হইল। আকাশ ভাঙ্গিয়া বৃষ্টি আরম্ভ হইল। সেই তুমুল নিনাদের মধ্যে বিমলের ক্ষুদ্র প্রাণটুকু অনন্তের আশ্রয় লইল! দীপ নির্ব্বাণ হইবামাত্র হৃদয়-বিদারক হাহাকার-ধ্বনি উত্থিত হইল। কৃত্তিবাস উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন "বিমল, মা! জন্মের মত ছেড়ে গেলি!" মনোরমা কাঁদিয়া উঠিলেন "মা বিমল, এত ক'রেও তোকে বাঁচাতে পা'রলাম না! কি সর্ব্বনাশ ক'রে গেলি!" কৃত্তিবাসের স্ত্রী ভূতলে পড়িয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন।

বিজয়া? বিজয়া পূর্ব্বেই অচেতন হইয়াছিলেন, নহিলে বুঝি সে মুহূর্ত্তে তাঁহারও দুঃখ-যন্ত্রণার অবসান হইত।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুঃখ প্রায়ই একাকী আসে না, একস্রোতে প্লাবনের ন্যায় আসে, এবং দুর্দ্দমনীয় তেজে কতশত সুখচিত্র ভাসাইয়া লইয়া যায়, কতশত সুরম্য উদ্যান মরুভূমিতে পরিণত করে। এক হাহাকার নিবৃত্ত হইতে না হইতে, অপর এক হাহাকার তাহার স্থান অধিকার করে; এক দুঃখ-স্মৃতি অপনীত হইতে না হইতে, অন্য এক শোকের কঠোর তাড়না অন্তরের নৈরাশ সজীব করিয়া তোলে।

বিমলা দুঃখময় সংসার ত্যাগ করিয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্নেহময়ী মাতা, আজন্ম-দুঃখিনী বিজয়া, মৃত্যুশয্যায় শায়িতা হইলেন। শোক-তরঙ্গের ভীষণ আঘাতে তাঁহার হৃদয় এককালে ভগ্ন হইয়া গিয়াছিল। যাহার উপর প্রাণের সমগ্র মায়া, যত্ন, ভালবাসা, আশা নিহিত রাখিয়া তিনি কথঞ্চিৎ শান্তি উপভোগ করিতেছিলেন, সংসারের সেই এক-মাত্র বন্ধন ছিন্ন হওয়ায় অভাগিনীর ইহলীলা সাঙ্গ হইতে চলিল! বিজয়ার শোকময় জীবনীর শেষ যবনিকা পতনোন্মুখ!

আজ তিন দিবস বিমলা ইহলোক ত্যাগ করিয়া গিয়াছে। যে শয্যায় তাহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছিল, বিজয়া উন্মাদিনীর ন্যায় সেই শয্যা অধিকার করিয়াছেন,—যেন তাহা কন্যার সহিত পরলোকে মিলনের একমাত্র শরণি। বিমলের মৃত্যুর দিন হইতে পলে পলে তাঁহার জীবনীশক্তি ক্ষীণ

এবং মুহুর্মুহুঃ চৈতন্য লোপ হইতেছিল। প্রবল জ্বরের প্রদাহে বিজয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেছিলেন। এইরূপে তিন দিবসের পর আজ জ্বর-বিরামের সঙ্গে বিজয়া কথঞ্চিৎ সুস্থ হইয়াছেন।

কে ওই দেবীমূর্ত্তি শুষ্কবদনে সজলনয়নে বিজয়ার শুশ্রূষা করিতেছেন? মানবী কি এত স্বার্থত্যাগ জানে? মানবী-হৃদয়ে কি এত মায়া, এত ভালবাসা, এত উৎকণ্ঠা স্থান পায়? ক্ষুৎপিপাসা, আরামনিদ্রা ত্যাগ করিয়া যে দেবী ইতিপূর্ব্বে বিমলের প্রাণরক্ষার্থে প্রাণপণ প্রযত্ন করিয়াছিলেন, আজ তাঁহাকে সেই একই ভাবে, অধিকতর উদ্যমের সহিত বিজয়ার শুশ্রূষায় নিযুক্ত দেখিতেছি। ধন্য রমণী, ধন্য মনোরমা, ধন্য দেবী! তোমার পদস্পর্শে জগৎ ধন্য! পর-লোকে তোমার সমাগমে গোলোক ধন্য হইবে।

অপরাহ্ণ তিনটার সময় নিদ্রাভঙ্গ হইলে বিজয়া চক্ষুরুন্মীলন করিলেন; তখন জ্বর বিচ্ছেদ হইতেছিল। চিকিৎসকের কথামত কৃত্তিবাস তাঁহাকে সংবাদ দিতে গিয়াছিলেন। কৃত্তিবাসের স্ত্রী রন্ধনশালায় বিজয়ার পথ্য প্রস্তুত করিতে-ছিলেন। লক্ষ্মী পরিশ্রান্ত হইয়া ঘরের একপার্শ্বে নিদ্রা যাইতেছিল। কাছে বসিয়া কেবল মনোরমা।

বিজয়া মনোরমার দিকে চাহিয়া ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"একটু জল।"

মনোরমা উৎফুল্ল বদনে অতি যত্নসহকারে বিজয়ার মুখে জল দিলেন। পরে অঞ্চলাগ্রে মুখ মুছাইয়া ব্যজন করিতে করিতে বলিলেন "দিদি, এখন একটু ভাল বোধ হচ্চে ত? কিছু খাবে?"

বিজয়া মস্তক নাড়িয়া বলিলেন "না"। তাঁহার নয়নদ্বয় চিত্রার্পিতের ন্যায় মনোরমার মুখখানি দেখিতে লাগিল। সে দৃষ্টি যে কত স্নেহ, কত কৃতজ্ঞতা মাখা তাহা বর্ণনাতীত। মনোরমা ডাকিলেন "দিদি?" বিজয়ার দৃষ্টি ধীরে ধীরে শূন্য গৃহের চতুর্দ্দিকে যেন কাহাকে অন্বেষণ করিতে লাগিল। তাহার পর হতাশ দৃষ্টি দ্বিতীয়বার মনোরমার শান্ত মুখখানির আশ্রয় লইল। মনোরমা দেখিলেন, বিজয়ার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ। তিনি অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না, অধোমুখে বিজয়ার শরীরে আস্তে আস্তে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

চারিটার সময় জ্বর এককালে বিচ্ছেদ হওয়ায় বিজয়া বেশ সুস্থ হইলেন। একটু পথ্যও দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে কতকটা বলাধান হইল। বিজয়া বেশ কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। কৃত্তিবাসের স্ত্রী ব্যজন করিতে করিতে বলিলেন—"হরিবাবু এক মাসের ছুটী পেয়েছেন; তোমাকে দেখতে আসবেন লিখেচেন। আজ কি কাল এসে পৌঁছবেন।"

বিজয়া মনোরমার দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ঠাকুরপো আস্‌চেন?"

মনোরমা—"হাঁ দিদি, ছুটী নিয়ে আসবার ত কথা আছে।"

বিজয়া—"ভগবান্ তোমাদের সুখী ও দীর্ঘজীবী করুন। শেষকালে তোমাদের মুখ দেখে যেন মর'তে পাই।"

মনোরমা—"বালাই, দিদি, তুমি ত সেরে উঠেচ।"

বিজয়া (কাঁদিতে কাঁদিতে)—"বোন, আমি আর কোন্ সুখে থাক'ব? কাকে নিয়ে সংসার করব? আমার আর কে আছে? আমি যে একে একে সব হারিয়েচি!"

মনোরমা বিজয়ার চক্ষু মুছাইয়া ছল ছল নয়নে বলিলেন—"ওকথা ব'ল না দিদি, তোমার সবই আছে।"

বিজয়া—"আমার সোণার ধীরেনকে হারিয়েছি! সে ধন কি এজীবনে ফিরে পাব?" আর বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

মনোরমা ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন—"দিদি, আমার খগেনকে তোমায় দিলাম; আজ থেকে তুমি খগেনের মা। আর আমার শাশুড়ী তোমারও শাশুড়ী। দিদি তুমি ত সব জান, তুমি যে আমাদের বড় আপন!"

বিজয়া অধীরভাবে মনোরমার গ্রীবা দুই হস্তে বেষ্টিত করিয়া তাঁহার বামস্কন্ধে মস্তক রাখিয়া বলিলেন—"মনো, আমার বিমল—(বড় দুঃখের মেয়ে,)—আমার বিমলকে কোথায় পাব?"

মনোরমা—"আমি তোমার বিমল হ'লাম। এতদিনে তোমাকে দিদি বলিচি, আজ থেকে মা ব'লে ডা'কব।"

বিজয়া তড়িদ্বেগে মস্তক উত্তোলিত করিলেন; মুহূর্ত্তকাল স্থির নয়নে মনোরমার বালিকা মুখখানি দেখিলেন, পরে ঈষৎ হাসিয়া বন্ধুর অমৃতস্রাবী ওষ্ঠ চুম্বন পূর্ব্বক বলিলেন—"মনো, বোন, আমার বিমল আমায় স্বর্গ থেকে ডাকচে; তুই হাসিমুখে বিদায় দে, আমি ওই খানে যাই।"

মনোরমা কাঁদিতে লাগিলেন। বিজয়া তাঁহার হাতখানি লইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন—"বোন, এই আমার শেষ কাল! বড় কষ্ট যে, স্বামীর মুখ দেখে, তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে ম'রতে পেলাম না।"

কৃত্তিবাসের স্ত্রী ও মনোরমা বিবিধ বিধানে বিজয়াকে বুঝাইতে লাগিলেন।

সন্ধ্যায় সময় কৃত্তিবাস প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তাঁহার পশ্চাতে হরিচরণ। হরিচরণকে আনিতে ষ্টেশনে একজন লোক পাঠান হইয়াছিল। তাঁহার আগমনে সেই বিপন্ন পরিবারের সকলেই আশ্বস্ত হইলেন। কৃত্তিবাস অতীব যত্ন ও সমাদরে হরিচরণকে অন্দর বাটীতে লইয়া গিয়া সাশ্রুনয়নে বলিলেন—"ভাই, আর কত যন্ত্রণা সহ্য ক'রব? চথের ওপর আর এসব দে'খতে পারি না। দয়া ক'রে এসেচেন, বিজয়াকে বাঁচান। মনোরমা সাক্ষাৎ দেবী, তাঁর ঋণ এজীবনে শোধ ক'রতে পা'রব না।" হরিচরণ তাঁহাকে প্রবোধ দিয়া বিজয়ার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলেন। কৃত্তিবাস বলিলেন "ভাই, বিজয়ের জ্বর ছেড়েচে; কিন্তু পুনরায় যদি বাড়ে, তা হলে বাঁচাতে পা'রব না। আহা, দিদির আমার শরীরে কিছু নাই, অস্থি-সার হ'য়েছে! এত শোক, এত যাতনা, তার ওপর এমন পীড়া! ওঃ, কি ভীষণ!"

সন্ধ্যার পর বিজয়ার শয্যাপার্শ্বে হরিচরণ ও কৃত্তিবাস আসিয়া উপবেশন করিলেন। মনোরমা ও কৃত্তিবাসের স্ত্রী অবগুণ্ঠন টানিয়া একটু সরিয়া বসিলেন। বিজয়ার ইঙ্গিতে মনোরমা তাঁহার অবগুণ্ঠন ঈষৎ টানিয়া দিলেন। বিজয়া হরিচরণের দিকে চাহিয়া বিমলের নাম করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হরিচরণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—"কি ক'রবে বল, মানুষের হাত নাই। সবই ভগবানের ইচ্ছা। সাধ্যমত চেষ্টার ক্রটী হয়নি, কিন্তু যার আয়ুঃ পূর্ণ হয়েচে, মানুষের কি সাধ্য তাকে বাঁচায়!"

বিজয়া—"কি পাপে আমার প্রতি ভগবানের এ শাস্তি?"

হরিচরণ চমকিলেন। কি পাপে? কে বলিবে কি পাপে? সৃষ্টির সে গূঢ় রহস্য কে ভেদ করিবে? যাঁহাতে রমণীজনোচিত গুণরাশি একাধারে বর্ত্তমান, সেই লক্ষ্মীরূপিণী বিজয়া কি ভীষণ অপরাধে ইহজগতে এবম্প্রকার দণ্ডিত হইতেছেন? বলুন পাঠক, পাপ পূর্ব্বজন্মের। কিন্তু বুঝিলাম না, বিগতজীবনে যে পাপী ছিল, পরবর্ত্তী জীবনে তাহার সাধুচরিত্র হওয়া কিরূপে সম্ভবপর। তবে কি তত্ত্বজ্ঞানের আশ্রয় লইয়া বুঝিব যে, মানবজীবনের পরীক্ষা, অভাব এবং দুঃখ-যন্ত্রণা অপ্রকৃত; আত্মাকে তাহাদের প্রভাব হইতে বহির্ভূত রাখিয়া পরম সত্যে লীন করাই প্রকৃত সুখ? বিজয়াকে সে শিক্ষা কে দিবে? হরিচরণ মনে মনে বলিলেন, সাধ্বী! তোমার কি পাপ? যদি মানিতে হয়, কাহারও পাপে তোমার এ দুঃখভোগ, তবে মনুষ্যের সামান্য জ্ঞানে যা' দেখিতে পাই, তাহাতে পাপ ভবেশের।

বিজয়া (চক্ষু-মুছিয়া)—"ঠাকুরপো, এইখানেই (শয্যা নির্দ্দেশ করিয়া), বিমল আমায় ছেড়ে গেছে। সে রাত্রিতে বড় অন্ধকার, ভারি ঝড় জল। (মনোরমার দিকে চাহিয়া) নয় বোন্? আঃ কি কষ্টেই মা'র আমার প্রাণটা বেরিয়েছে! (মৃদুস্বরে মনোরমাকে) আমার বুক্‌টা যেন ফেটে যাচ্চে, ভেতরে আগুন জ্ব'লচে।" মনোরমা নিকটে আসিয়া বিজয়ার পার্শ্বে বসিলেন, এবং ধীরে ধীরে তাঁহার বক্ষে হাত বুলাইতে লাগিলেন। হরিচরণ নীরবে অশ্রুমোচন করিতেছিলেন, তাঁহার হৃদয় সে করুণ আক্ষেপে নিষ্পেষিত-প্রায় হইল। বিজয়া কিয়ৎক্ষণ পরে একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন—

"আঃ বাঁচলাম্।" হরিচরণকে উঠিতে উদ্যত দেখিয়া ক্ষীণ-স্বরে বলিলেন—"যেও না ঠাকুরপো। আমার শেষকাল, গুটীকতক কথা ব'লবো।" হরিচরণ চক্ষু মুছিয়া উপবেশন করিলেন, এবং বলিলেন "বউ, ওকথা ব'লো না। তুমি সেরে উঠবে। আমরা আবার তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাব। তোমার কোন কষ্ট, বা অভাব হবে না।"

বিজয়া (ঈষৎ হাসিয়া)—"মনোরমাও ওই কথা বলে। কিন্তু ঠাকুরপো, আমি বেশ জানচি, আমার দিন সংক্ষেপ। এইখান (বুকে হাত দিয়া) পুড়ে যা'চ্চে। মরাই আমার সুখ।" কৃত্তিবাস সেখানে আর বসিতে পারিলেন না, উঠিয়া বাহিরে বারান্দায় আসিলেন।

গৃহমধ্যে সকলে নিস্তব্ধ। মনোরমা বিজয়ার বক্ষে হাত বুলাইতেছিলেন। কিয়ৎকাল বিশ্রাম লইয়া বিজয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তিনি (ভবেশ) কেমন আছেন? অনেকদিন কোন খবর দেননি। বিমল নাই, তিনি কি"

হরিচরণ বিজয়ার অলক্ষ্যে দুই ফোঁটা

চুপ করিয়া রহিলেন।

বিজয়া—"বল ঠাকুরপো, তিনি কেমন

হরিচরণ—"ভাল আছেন।"

বিজয়া—"তাঁকে বুঝিয়ে ব'লো, এত যন্ত্রণার পর মরণই আমার শান্তি। তবে মৃত্যুকালে তাঁর মুখখানি দেখে ম'রতে পেলাম না, এই আমার একমাত্র দুঃখ। বুঝি যতদিন তাঁর ক্ষমা না পাব, ততদিন স্বর্গে আমার আত্মার স্থান হবে না। স্বামী দেবতা, ঈশ্বর তুল্য।"

সকলেই কাঁদিয়া ফেলিলেন। ক্ষোভে, করুণায় হরিচরণের বক্ষঃস্থল যেন বিদীর্ণ হইল। তিনি বিজয়ার পদধূলি মস্তকে লইয়া বলিলেন—"দেবি, ধন্য তুমি! স্বর্গই তোমার স্থান!"

বিজয়া—"ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, তোমরা দীর্ঘ জীবী হ'য়ে সুখে সংসার কর। জন্মান্তরে যেন তোমাদের আপনার জন পাই। দাদা কৈ?"

কৃত্তিবাস কাছে আসিয়া বলিলেন—"কি বিজয়?"

বিজয়া—"দাদা, তুমি আমাদের জন্য কত দুঃখ পেলে।"

কৃত্তিবাস (কাঁদিতে কাঁদিতে)—"দিদি, সে দুঃখভোগের ফল কি এই হ'ল?"

বিজয়া—"আমার মৃত্যুর জন্য তুমি কোন আক্ষেপ ক'র না। (মনোরমাকে দেখাইয়া) তোমার একটী ব'ন থা'কল। দাদা, মনোরমার কাছে যখন তোমার প্রশংসা ক'রতাম, তোমার ...ত্বর কথা ব'লতাম, মনোরমা দুঃখ কত্ত যে, তার ... মনোরমা একদিন জিজ্ঞাসা ক'রেছিল—'দিদি, ...তেও কি দাদার যত্ন বেশী?' আমি ব'লেছিলাম ... এই পর্য্যন্ত ব'লতে পারি, বাবা যে বেঁচে নাই, তা আমার এক মুহূর্ত্তের জন্যও মনে হয়না।' (একটু থামিয়া) আমার শেষকালে মনোরমার এই একমাত্র অভাব পূর্ণ ক'রে যাব। (মনোরমার হস্ত ধরিয়া) বোন্, এই তোমার দাদা। এঁর কাছে তোমার কোন লজ্জা নাই। তুমি সচ্ছন্দে কথা ক'য়ো, দাদা ব'লে ডেক, আমার মত আবদার ক'রো। দাদারও বোনের অভাব দূর হবে। (কৃত্তিবাসের দিকে চাহিয়া) দাদা! মনোরমাকে যত্ন ক'রো, মাঝে মাঝে তত্ত্ব

ক'রো, আমি স্বর্গে থেকে সুখী হব। এমন বোনটী আর পাবে না। আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মান্তরে তোমাকে দাদা পাই, কিন্তু যেন তোমার এত কষ্টের কারণ না হই।"

হুতাশে গৃহ পরিব্যাপ্ত হইল। লেখনী সে শোকদৃশ্য বর্ণন করিতে অক্ষম।

* * * *

বিজয়া রক্ষা পাইলেন না। পরদিবস জ্বর ফুটিল। এক অহোরাত্র ভোগের পর জ্বর বিচ্ছেদ আরম্ভ হইল,—বিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে বিজয়ার প্রাণবায়ু বহির্গত হইল। পাঠক, আপনি অশ্রুপাত করিতেছেন? করুন। এ শোকাশ্রু বড় পবিত্র। বিজয়ার সঙ্গে একটী আদর্শ রমণী ভূমণ্ডল হইতে তিরোহিত হইলেন, সুতরাং মানব মাত্রেই সন্তপ্ত হইবে। কিন্তু বিজয়া তাহার কার্য্য সাধিয়াছেন। তিনি স্পষ্টাক্ষরে এক মহান্ তত্ত্বের নিত্যতা প্রতিপাদন করিয়াছেন। সংসারে পাপ ও পুণ্যের ঘাত-প্রতিঘাত প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে, এবং সে ঘাত-প্রতিঘাতের অবশ্যম্ভাবী ফল,—পুণ্যের জয়, পাপের পরাজয়। বিজয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়া সেই পরম সত্যের একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। পাঠক! তাহা ক্রমশঃ উপলব্ধি করিবেন। আপাততঃ বিজয়ার ইহলোকের দুঃখ শেষ হইল।

আমরা এইখানেই এ পরিচ্ছেদের উপসংহার করিব। শীর্ণদেহা, রোরুদ্যমানা, নৈরাশ্যদগ্ধপ্রাণা মনোরমাকে হরিচরণ গৃহে লইয়া আসিলেন।

প্রথম অংশ সমাপ্ত।